তরঙ্গ ভঙ্গ

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

তরঙ্গ ভঙ্গ

সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ

ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার
সেলিম
বালুয়া কান্দী

নওরোজ কিতাবিস্তান
বাংলা বাজার, ঢাকা—১

প্রকাশক ঃ
এম, এন, আলী
৪৬, বাংলা বাজার
ঢাকা

TARANGA BHANGA
A Drama
by
Syed Waliullah

প্রথম প্রকাশ ঃ
আষাঢ় ঃ ১৩৭১
দ্বিতীয় প্রকাশ :
অগ্রহায়ণ ঃ ১৩৭৫

প্রচ্ছেদপট ঃ
কাইয়ূম চৌধুরী

মুদ্রণ ঃ
এ. আর. খান
ইডেন প্রেস
৪২/এ, হাটখোলা রোড
ঢাকা—৩
[পূর্ব পাকিস্তান]

[redacted]

[redacted]

22|00

তরঙ্গ-ভঙ্গ

ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার
সেলিম
বাসুয়া কাশী

চরিত্র-তালিকা

জজ
মৌলবী আবদুস সাত্তার নেওলাপুরী
উকিল ঃ মাহবুব হোসেন
ভিখারিণী ঃ
মতলুব আলী ঃ একজন অকৃতকার্য কন্ট্রাক্টর
অজানা যুবক ঃ
আসামী ঃ আমেনা
বারিশ পীর ঃ

অপ্রধান চরিত্র ঃ

কেরানী, হেকিম, দুইজন পুলিশ,
চাপরাশী, বই বিক্রেতা, তিনজন
গ্রামবাসী এবং কয়েকজন শ্রোতা

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

[বিচারালয়ের পার্শ্বদৃশ্য। মঞ্চের ডান দিকে দুই ফুট উঁচু কাঠের রেলিং-ঘেরা পাটাতনের উপর বিচারকের চেয়ার-টেবিল। বিচারকের সামনে ডান দিকে কাঠগড়া। সরাসরি বাঁ পাশে একজন কেরানীর ছোটখাটো ধরনের টেবিল-চেয়ার এবং পেছনে দুটি পুরাতন ফাইল-নথিপত্রের আলমারি। বিচারকের সামনে কয়েক সারি বেঞ্চি। সামনের সারি ছাড়া অন্যান্য সারিতে ব'সে দশ-বারোজন শ্রোতা। সামনের বেঞ্চিতে চশমাধারী উকিল এবং ফরিয়াদী মৌলবী আবদুস সাত্তার নেওলাপুরীর বসার স্থান। মঞ্চের পেছন দিকে দাঁড়িয়ে একজন চাপরাশী এবং দুই জন পুলিশ। মঞ্চের বাঁ দিকে দর্শকের কাছাকাছি মাটিতে ব'সে মধ্য বয়সী এক ভিখারিণী। পোশাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার, চেহারা মোটামুটি সুশ্রী। সামনে একটি ভাঙ্গাপাত্র।

কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আসামী আমেনা। গ্রাম্য মেয়ে, বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ। পরনে সাদা শাড়ী, মাথায় কপাল পর্যন্ত ঘোমটা, দৃষ্টি অবনত। কাঠগড়া কিছুটা অন্ধকারাচ্ছন্ন, তাই আসামীর চেহারা দর্শকের কাছে অস্পষ্ট থাকবে।

পর্দা উঠলে দেখা যাবে বিচারকের আসনে জজ নিদ্রাচ্ছন্ন। মাথা পেছনের দিকে হেলানো, মুখটা কিছু খোলা। বয়স পঞ্চাশের উপরে ॥

সমগ্র মঞ্চ নিস্তব্ধ। সে-নিস্তব্ধতার মধ্যে কেবল জজের উচ্চ নাসিকাধ্বনি শোনা যাবে।

মঞ্চের প্রত্যেক ব্যক্তির দৃষ্টি জজের প্রতি। কেরানী মাথাগুঁজে কলম ঘষছিলো, সে মুখ তুলে জজের দিকে একবার তাকায়, তারপর চাপরাশীর সঙ্গে দৃষ্টিবিনিময় ক'রে। শ্রোতাদের মধ্যে থেকে দুয়েকজন উঠে ভালো ক'রে চেয়ে দেখে, জজসাহেব সত্যি ঘুমিয়ে কিনা।]

চাপরাশী। (বেরিয়ে যেতে যেতে, পুকারের আওয়াজে) জজসাহেব জেরা আরাম করছেন, আপনারা কেউ গোলমাল করবেন না, ইত্যাদি।

(উকিল-মক্কেল এবং দর্শকদের মধ্যে নিশ্চলতা ভাঙ্গে। সবাই পিঠ শিথিল করে। একটি আধা-ময়লা রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে উকিল ব'সে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চে গুঞ্জন শুরু হয়। একটি পুলিশ বিড়ি ধরায়। কেবল আসামী পূর্ববৎ ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে থাকে। শীঘ্র সামনের বেঞ্চিতে উকিল এবং ফরিয়াদী মৌলবী আবদুল সাত্তার নেওলাপুরীকে কানে-কানে আলাপ করতে দেখা যাবে। দর্শকের মধ্যে একজন হঠাৎ সিটি দিয়ে উঠবে। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে তার দিকে রাঙা চোখে তাকাবে একটি পুলিশ। ঘোষণা-কার্য শেষ করে চাপরাশী মঞ্চে ফিরে আসবে।)

কেরানী। (কাগজপত্র থেকে মাথা তুলে) কিহে রহমত আলী, পান-দোক্তা আছে ?

একটি পুলিশ। কোথায় পান-দোক্তা ! ছেড়ে দিয়েছি না ? (চাপরাশীর দিকে তাকিয়ে) কই কেরামত শেখ, ছোট সাহেবকে কিছু পান-দোক্তা দাও।

চাপরাশী। (রেগে) কী কঞ্জুসীপানা ! দেও না একটু পান-দোক্তা। অত ক'রে চাইছেন।

পুলিশ। (কেরানীকে) কেরামত শেখের ডিবা পান-দোক্তায় ঠাসা। তার কাছে চান ছোটসাহেব।

দ্বিতীয় পুলিশ। কেন শোরগোল করছো ! জজসাহেব ঘুমিয়ে না ?

কেরানী। (মুখ না তুলে, পানের কথা ভুলে গিয়ে) কিহে রহমত আলী, তারিখ কী আজ?

প্রথম পুলিশ। তারিখ দিয়ে কী হবে? স্ট্যাম্প মেরে দেন, যা থাকে কপালে।

চাপরাশী। (হেসে বোঝায়) তার কথার মতলব হলো, স্ট্যাম্পের কপালে যা-ই তারিখ থাকে তাই সই। (সজোরে হাসে)

দ্বিতীয় পুলিশ। (ধম্‌কে) আহ্, কেন এত গলাবাজি। তুমি তো নিজেই পুকার দিয়ে এলে: জজসাহেব জেরা আরাম করছেন, আপনারা—

চাপরাশী। (কথা কেড়ে নিয়ে) কেউ গোলমাল করবেন না। (গম্ভীরভাবে) সে তো পাবলিকের জন্য। আমরা সরকারী লোক। (কেরানীর দিকে চেয়ে) কী বলেন? পুলিশ হ'লে মাথাটা কিছু ভারী হয়, তাই না ছোটসাহেব? (কেরানী নিরুত্তর) কার সঙ্গে কথা বলি! এসো রহমত আলী, কিছু পান-দোক্তা খাওয়া যাক্। (পকেট থেকে ডিবা বের ক'রে তার দিকে এগিয়ে যাবে।)

প্রথম পুলিশ। (সজোরে) বললাম না ছেড়ে দিয়েছি! (কিন্তু এগিয়ে এসে পান নেয়, তারপর দু'জনে নিম্নগলায় কথালাপ শুরু করে।)

একটি শ্রোতা। (কৃত্রিম দুঃখের সঙ্গে) আহা!

দ্বিতীয় পুলিশ। (চোখ রাঙিয়ে) আবার গোলমাল?

শ্রোতা। কী জুলুম, গোলমাল কোথায়? হঠাৎ দুঃখ হলো মনে, ভাবটা চেপে রাখতে পারলাম না।

দ্বিতীয় পুশিল। দিনদুপুরে দুঃখ কিসের?

প্রথম শ্রোতা। আসামীর কথা ভাবছিলাম। সবাই বলছে তার ফাঁসি হবে। ভাবলে দুঃখ হয় না?

যুবক। (বিস্ময়ের সঙ্গে তার দিকে তাকায়।)

দ্বিতীয় শ্রোতা। (পুলিশকে সে ঠাট্টা করছে। সবাই বলছে, ফাঁসি হবে না। জজসাহেব গো ধরেছেন, ফাঁসি দেবেন না। দেবেন না যে দেবেন না-ই। মামলা দেড় মাস মুলতবী ছিলো। না, ফাঁসি হবে না।

প্রথম শ্রোতা। (কৃত্রিম ক্রোধে) রায় বেরুনো পর্যন্ত কে সে-কথা ঠিক-ঠিক বলতে পারে?

দ্বিতীয় শ্রোতা। সে-ই হলো কথা। রায় বের হবে না। জজসাহেব ফাঁসি দেবেন না, রায়ও বেরুবে না। (যুবকের দিকে চেয়ে) আজ বুঝি আদালতে প্রথম দিন?

যুবক। (মাথা নেড়ে জানায়, না, তার প্রথম দিন নয়।)

প্রথম শ্রোতা। তবে চোখ এত বড়-বড় কেন?

দ্বিতীয় শ্রোতা। (এক নজর তাকিয়ে) হাবা-গোবা হবে।

প্রথম শ্রোতা। আদালত না চিড়িয়াখানা! (যুবককে) কোন দলে?

যুবক। (মনে হয় কথাটা ভেবে দেখে, কিন্তু কিছু বলে না।)

প্রথম শ্রোতা। হাবা-গোবাই হবে। (আবার দ্বিতীয় শ্রোতাকে) সে যাহোক, বাজারে এক জনরব। সেটি এই যে, মাস কয়েক আগে জজসাহেব সন্ধ্যাবেলায় পুকুরের ধারে হাওয়া খাচ্ছিলেন। গায়ে ফিনফিনে কোর্তা, ইস্ত্রী-করা পায়জামা, মাথায় কিশ্‌তি টুপি, পায়ে খড়ম। আকাশে মঘ নেই; তবু হঠাৎ তার এ-মাথা সে-মাথা চিড়ে একটি বিজলী ঝল্‌কে উঠলো। দেখে তিনি খাম্বার মত দাঁড়িয়ে পড়লেন। কখন দূরে একটা লোক এসে যেন দাঁড়ালো। তারপর সন্ধ্যা হ'য়ে গেলো, কিন্তু না জজসাহেব না ঐ লোকটি নড়ে।

দ্বিতীয় শ্রোতা। আজগুবী কথা! কে দেখেছিলো বিজলীর ঝলকানি?

প্রথম শ্রোতা। কমর মিঞা। সে পুকুরে ওজু করতে এসেছিলো। সে তার ওজু শেষ করতে পারেনি।

দ্বিতীয় শ্রোতা । গাঁজাখুরী কথা ।

প্রথম শ্রোতা । বিজলী না হোক, কিছু একটা ঝলুসে উঠেছিলো। আসল কথা, সেই থেকে জজসাহেব আর সে-মানুষ নেই।

দ্বিতীয় শ্রোতা । সেদিনের কথা বলো। কমর মিঞা কী করলো ?

প্রথম শ্রোতা । সে কী করবে ? তাকিয়ে তাকিয়ে হঠাৎ তার ভয় হলো। জজ আর ঐ লোকটি নড়ে-চড়ে না, কারো মুখে কথাও নেই। কিন্তু তবু তাদের মধ্যে কেমন ভাবের আদান-প্রদান হ'তে লাগলো যেন। ভাবতেই গা শিউরে উঠে।

দ্বিতীয় শ্রোতা । সে যাই হোক, সে দিন থেকে জজসাহেব আর জজসাহেব নেই।

প্রথম শ্রোতা । আসল কথা তা-ই। জজসাহেব আর জজসাহেব নেই। (মৌলবী আবদুস সাত্তার নেওলাপুরী হঠাৎ ধৈর্য হারিয়ে ক্ষীপ্তভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বিরক্তির সঙ্গে বিড়বিড় করে। তার পরনে ধবধবে সাদা আলখাল্লা, মাথায় কিশ্‌তি টুপি মঞ্চের সকলের দৃষ্টি তার উপর নিবদ্ধ হবে।)

আবদুস সাত্তার । এ মামলায় বড় দেরী হচ্ছে! (জজের দিকে ফিরে তাকায়, বিরক্তিভরে মাথা নাড়ে। তারপর মঞ্চের সামনে এসে কিছু পায়চারি করে দর্শকের দিকে তাকিয়ে) জজ, আসামী, সাক্ষী-সাবুদ, উকিল-মক্কেল সবাই মওজুদ। যে কোন দিনের মত আজও এ বিচারালয়টি ন্যায়-অন্যায় বিচারের কাজে লিপ্ত। কিন্তু তবু এ-দৃশ্যে একটা খুঁত আছে। বিচারালয়ের প্রধান কর্মকর্তা নিদ্রাচ্ছন্ন। হয়তো আপনারা অবাক হ'য়ে ভাবছেন, এ কী অদ্ভুত কথা ? দিনদুপুরে আদালতের বিচার কার্যের মধ্যে বিচারপতি কী ক'রে ঘুমাতে পারেন ? জজসাহেব কি অসুস্থ ? রাতে কি তাঁর ঘুম হয়নি ? বলা বাহুল্য, নিদ্রা একটি শারীরিক প্রয়োজন। কিন্তু স্বাভাবিক শারীরিক প্রয়োজনের বাইরে যে নিদ্রার অনুরক্ত, সে অলস বা অসুস্থ। জজসাহেব অলস নন, অসুস্থও নন অথচ তিনি ঘুমিয়েই

আছেন। সে-বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ নেই। (থেমে রহস্যময় কন্ঠে) এ ঘুমের কারণ কী ? কথাটা হয়তো হেঁয়ালির মত শোনাবে আপনাদের কাছে।

শ্রোতাগণ। (সমবেত কন্ঠে) হেঁয়ালি ? কিসের হেঁয়ালি ?

আবদুস সাত্তার। কী বলবো, দুনিয়া বড়ই আজব স্থান। চাঁদ-সুরুয-তারার রহস্য দূরে থাক, এ-দুনিয়ারই শত-সহস্র রহস্য ভেদ করার ক্ষমতা রাখে কোন মানুষ ? খোদার সব সৃষ্টিই রহস্যময়, যে-রহস্য তীব্র সূর্যালোকেও কম দুর্ভেদ্য হয় না। তবে একটা কথা। দিনে বা রাতে কোন সময়েই খোদার রহস্য মনে কখনো ভীতির সৃষ্টি করে না।

একজন শ্রোতা। খাঁটি কথা ! খোদার রহস্যে কোন ভয় নেই।

আবদুস সাত্তার। তবে হ্যাঁ, সব রহস্যই আবার খোদার রহস্য নয়, সব রহস্য মহিমাময়ও নয়। সত্য যে ঢাকতে চায় সেও রহস্যে আশ্রয় নেয়। নিদ্রার কথা ভাবুন, ক্লান্তির বন্ধু যে নিদ্রা খোদার বিশেষ দান।

একজন শ্রোতা। (কিছু অধৈর্য হয়ে) বড় পাঁয়তারা করছেন নেওলাপুরী সাহেব ! মনের কথা খুলে বলুন।

আবদুস সাত্তার। বলছি, শুনুন। রহস্যের মত সব নিদ্রা আবার সত্য নয়, রহস্যময় ঠেকলেও সব সময়ে তা খোদার রহমতও নয়। নিদ্রা ভীত লোকের আশ্রয় হয়, চতুরেরও হাতিয়ার হয়। হয়তো এখনো আপনাদের কাছে কথাটা হেঁয়ালির মত শোনাচ্ছে।

একজন শ্রোতা। (বেশ কিছু অধৈর্যতার সঙ্গে সমস্বরে) কি সে হেঁয়ালি ? খুলে বলুন।

আবদুস সাত্তার। বড়ই আজব স্থান এই দুনিয়া। চোখ বন্ধ থাক খোলা থাক্ সমাজের ছকবাঁধা নক্শার কোন পরিবর্তন ঘটে না। কিন্তু কেউ না কেউ শুধু চোখ বুজেই সে নকশাকে উড়িয়ে দিতে চায়।

একজন শ্রোতা। (প্রায় ধৈর্যহারা হ'য়ে) সবই হেয়ালি! খুলে বলুন নেওলাপুরী সাহেব, খুলে বলুন।

আবদুস সাত্তার। (হঠাৎ ছড়া আবৃত্তির ঢঙে) শোন তবে শোন :

হেঁয়ালির আগাছায় কার প্রাণ যায়
জজ না আসামী—কে কাঠগড়ায় ?

উকিল। (উঠে দাঁড়িয়ে, দর্শকের দিকে তাকিয়ে) আমি উকিল। আইনের ঘোলঘোলাট হেরফের অলিগলি বুঝি, হেঁয়ালি বুঝি না। বিশ বছর আমার প্র্যাক্‌টিশ, তবু কথার চক্করে বা সাতে-পাঁচে আমি যাই না। সোজা কথা দিল খুলে, আর তেড়া কথা সিধে ক'রে বলি। তবে দীর্ঘ বিশ বছর মামলা-মকদ্দমায় কাটিয়ে একটা কথা শিখেছি। অভিজ্ঞতার অন্য নাম হলো ধৈর্য। ধৈর্য ধ'রে থাকলে কী না হয়।

হেকিম। (লাফিয়ে উঠে) মাহবুব হোসেন সাহেব আমাদের করিমগঞ্জের শ্রেষ্ঠ উকিল। ভাই সকল, উন্নতিই যদি আপনাদের মনস্কামনা হয় তবে হেকিম বদ্‌রোদ্দোজার গুলী এস্তেমাল করতে বিলম্ব করবেন না।

উকিল। সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মানে, ধৈর্য ধরে থাকলে কিনা হয়। বিজ্ঞতার অন্য নাম হলো ধৈর্য! না, আমি বেচইন হই না সহজে।

আবদুস সাত্তার। প্রিয় ভাই-বোন, সাহেবান-সাহেবা! আরো শুনুন :

কাঠবিড়ালের পায়ে ঝুমুর, কে ডেঙ্গালো দেয়াল
লেজ নাই ডানা নাই—কেমনতর সে-সওয়াল ?

উকিল। না, ধৈর্যের আমার শেষ নেই। তাছাড়া আইনে কোথাও একটু ফাঁক-ছিদ্র নেই যে আসামী আমার হাত থেকে ফস্কে যেতে পারে। কাজেই আমার ভাবনার কারণ নেই।

জজ। (হঠাৎ জেগে উঠে এধার-ওধার চেয়ে গর্জন ক'রে) আদালতে কে বিড়ি খায় ?

[মঞ্চে আকস্মিক নীরবতা নাবে।]

দোষী পুলিশ। (হাতের বিড়ি গোপনে নিভিয়ে শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে) কে বিড়ি খায় জজসাহেবের সামনে ?

জজ। সব সহ্য হয়, এ-গন্ধ সহ্য হয় না।

আবদুস সাত্তার। (সহানুভূতি দেখিয়ে) গন্ধটি আমারও সহ্য হয় না জজ-সাহেব। বড়ই বদ্‌গন্ধ।

জজ। (কেরানীকে) নোটিশ দিয়ে দাও। আদালতে কেউ বিড়ি খেলে দশ-দশ টাকা ফাইন হ'য়ে যাবে। কী করো তুমি? তোমার নজর থাকে কোথায়?

কেরানী। (কিছু ভীতকন্ঠে) কাগজ-পত্র নিয়ে মশগুল ছিলাম—

জজ। কাগজ-পত্র নিয়ে মশগুল ছিলে! কাগজ-পত্রে নাক ডুবিয়ে ঘুমাও, গন্ধ পাবে কী ক'রে? (এধার-ওধার চেয়ে) তারপর?

চাপরাশী। (আদালতের কাজ শুরু হচ্ছে দেখে আবার বাইরে যেতে-যেতে পুকারের সুর) আদালত আবার বসেছে, আপনারা কেউ গোলমাল করবেন না, ইত্যাদি।

উকিল। যে-কথা বলছিলাম।

জজ। (বিরক্তির সঙ্গে) সে-কথা পরে হবে। কই, সাক্ষী-সাবুদ কোথায়? আসামী কোথায়?

উকিল। বেয়াদবী মাফ করবেন, কিন্তু আসামী আপনার সামনে দাঁড়িয়ে, সাক্ষী-সাবুদও সব হাজির।

জজ। (ভ্রূ কুঁচকিয়ে আসামীর দিকে তাকিয়ে, সজোরে) কী নাম আসামীর?

আমেনা। (নত মাথায় দাঁড়িয়ে থাকে, উত্তর দেয় না।)

উকিল। নাম আমেনা, জজসাহেব।

জজ। (নামটা যেন মনে পড়ে) আমেনা, আমেনা! নামটা কোথাও শুনেছি যেন। (সজোরে) বয়স কত?

উকিল। পঁচিশ-ছাব্বিশ।

জজ। (আপন মনে) বয়স বেশি নয়। (সজোরে) বাপের নাম?

উকিল। আফতাব শেখ।

জজ। (বিস্মিত হয়ে আপন মনে) কী আশ্চর্য, সবারই নাম আফতাব শেখ! (সজোরে) সাকিন জেলা?

উকিল। গ্রাম নেওলাপুর, থানা রাঙাদীঘি, জেলা ঢাকা।

জজ। (মনে করার চেষ্টা ক'রে) নেওলাপুর, নেওলাপুর। (হঠাৎ মনে পড়ে) নেওলাপুর! বুঝেছি, সে-ই চুরির মামলা! কেন, সে-মামলা তো শেষ হ'য়ে গেছে। আসামী এখনো কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে কেন?

উকিল। আবার বেয়াদবী করছি, মাফ করবেন। শেষ হওয়াতে দূরের কথা এ-মামলা ধরতে গেলে শুরুই হয়নি।

জজ। (কেরানীর দিকে চেয়ে) কি হে, সে-সোনার হারের মামলা না? (কেরানী কাগজে মুখ নত ক'রে রাখে) না, আমার স্পষ্ট মনে আছে, চুরির মামলা!

উকিল। এটা চুরির মামলা নয় হুজুর। কী বলবো, এ মামলার নালিশ অতি গুরুতর।

জজ। (বিস্ময়ে) গুরুতর নালিশ?

উকিল। বড়ই গুরুতর! তাই তো জনরব উঠেছে।

জজ। জনরব? কিসের জনরব?

উকিল। দেড় মাস কেটে গেলো কিন্তু মামলার বিচার হয় না। তাই তো জনরব উঠেছে।

জজ। (একটু ভেবে, হুঙ্কার দিয়ে) আমি জনরবে বিশ্বাস করি না। চুরির নালিশ নয় তো, কিসের নালিশ? জলদি, জলদি করুন।

উকিল। বড় গুরুতর নালিশ, তাই সময় নেবে বলতে। (শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে) এগিয়ে আসুন, মৌলবী আবদুস সাত্তার নেওলাপুরী, এগিয়ে আসুন।

চাপরাশী। (বাইরে যেতে যেতে পুকার ক'রে) মৌলভী আবদুস সাত্তার মেওলাপুরী! মেওলাপুরী আবদুস সাত্তার—

আবদুস সাত্তার। (রাগতকন্ঠে) এই যে আমি এখানে। মাথায় চোখ নেই? কমসেকম নাম তো ঠিক ক'রে বলো! (জজের দিকে চেয়ে) হুজুর, আমিই মৌলবী আবদুস সাত্তার নেওলাপুরী। নেওলাপুর নামক ক্ষুদ্র একটি গ্রামে আমার গরীবখানা।

জজ। (তাকে আপাদমস্তক দেখে) আপনাকে যেন দেখেছি কোথাও।

আবদুস সাত্তার। নিশ্চয় দেখেছেন, হুজুর! শুধু আজ নয়, আপনার দরবারে হাজির হবার সৌভাগ্য আমার বহুবার হ'য়েছে। দিন দুনিয়ায় আমার খেয়াল নেই, সর্বদা খোদার কাজেই ব্যস্ত থাকি। কিন্তু সমাজের মধ্য থেকে যখন কর্তব্যের ডাক আসে তখন তা অবহেলা করতে পারি না। খোদার রহমতে আশে-পাশে আমার কিছু সুনামও আছে। নেকদিল, দরদবান এবং পরেজগার লোক হিসেবে।

জজ। (অধৈর্যের সঙ্গে) ভালো! ভালো! চটপট ক'রে বলুন আপনার বক্তব্য।

আবদুস সাত্তার। তবে শুনুন। সন উনিশ শ পঞ্চাশ, জৈষ্ঠ মাসের তেরো তারিখ। খোদার রহমতে আমার স্মরণশক্তি অত্যন্ত প্রখর। অবশ্য হেকিম বদরোদ্দোজার দাওয়াই-ও নিয়মিত ভাবে এস্তেমাল ক'রে থাকি।

হেকিম। (লাফিয়ে উঠে) আমার গুলী শুধু স্মরণশক্তি যে তীক্ষ্ণ করে তা নয়, সর্বপ্রকার ব্যাধিতেও ফল দেয়। দয়া ক'রে একবার পরীক্ষা ক'রে দেখবেন, বিলম্ব করবেন না।

জজ। জৈষ্ঠ মাসের তেরো তারিখ, মস্তিষ্কে গোলযোগ নেই। তারপর? জলদি জলদি।

আবদুস সাত্তার। আমার বক্তব্য বড়ই গুরুত্বময়, তাড়াহুড়া ক'রে বলা যায় না। শুধু তাই নয়, ভূমিকা ছাড়া বললে এ-বক্তব্য

পরিষ্কার হবে না! তাই তেরোই জৈষ্ঠের কথা পরেই বলবো। আপনার অনুমতি নিয়ে প্রথমে একটা নফ্‌স শুনাই। (কিচ্ছা বলার ভঙ্গীতে) বহুদিন আগের কথা। অনেক ব্যবসা-বাণিজ্যের সামগ্রী নিয়ে মরুভূমি অতিক্রম ক'রে একটি দীর্ঘ কাফেলা আদান থেকে বাদান যাচ্ছিল।

শ্রোতাগণ। (গল্পের গন্ধ পেয়ে সোজা হ'য়ে বসে) আ!

আবদুস সাত্তার। (কিছু উৎসাহিত হ'য়ে) পথে স্থানে স্থানে ডাকাতের বড় ভয়। হিংস্র বেদুইন বালুতে দাড়ি পতে, দিগন্তে রক্তাক্ত চোখ পেতে রাতদিন নিঃসহায় কাফেলার অপেক্ষায় থাকে। তাই বাদান-অভিমুখী কাফেলায় কারো মনে শান্তি নেই। মূল্যবান সামগ্রী ছাড়া অন্য এক কারণেও আশঙ্কার শেষ ছিলো না। সে-কাফেলার সঙ্গে যাচ্ছিলেন সুবাহ্‌দার আবদুর রহ্‌মানের দ্বিতীয় স্ত্রী সুন্দরী যুবতী আখতারী, যাঁর রূপের কথায় লু ছুটতো আর দুই হাত দীর্ঘ ঘাস গজাত ধূ-ধূ মরুভূমিতে।

শ্রোতাগণ। (রোমাঞ্চিত কন্ঠে) ইস্‌!

আবদুস সাত্তার। এই অতীব সুন্দরী নারীর স্বামী তখন বাদান এলাকায় বিদ্রোহদমনে ব্যস্ত। ছয় মাস হ'য়ে গেছে, স্বামী ফেরেন নি। বিরহ বেদনা সহ্য করতে না পেরে আখতারীবিবি স্বামীর সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে রওনা হ'য়ে পড়েছেন, সঙ্গে দেড় বছরের শিশু। বিপদ-সঙ্কুল মরুপথ আর তীক্ষ্ণ সূর্যের কঠোরতা তাঁকে ভয় দেখাতে পারে নি।

একজন শ্রোতা। বীর নারী! তারপর?

আবদুস সাত্তার। আসরের নামাজের সময় পেরিয়ে গেছে, এমন সময় হঠাৎ দূরদিগন্তে বালুর ঝড় উঠলো। লু নয়, দস্যুদল। চোখের পলকে তারা ঝাঁপিয়ে পড়লো কাফেলার উপর। দেখতে-না-দেখতে উট আর মানুষের লাশ স্তূপাকার হ'য়ে উঠলো, আকাশ ছিন্নবিছিন্ন হ'য়ে গেলো আহতদের মর্মান্তিক আর্তনাদে। খুনজখম পুটপাট শেষ হ'লে দস্যুনেতার

লালসাময় দৃষ্টি পড়লো সুন্দরী আখতারীর উপর। বুদ্ধিমতি আখতারীবিবি এর জন্যে তৈরী হ'য়ে ছিলেন। ক্ষীপ্রগতিতে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, দস্যুনেতা! তুমি আমার চোখে অতীব ঘৃণার বস্তু, তবু তুমি যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই যাবো। তবে একটি শর্ত আছে। দস্যুনেতা প্রশ্ন করলো কী শর্ত?

শ্রোতাগণ। (সমস্বরে) কী সে-শর্ত?

আবদুস সাত্তার। আখতারীবিবি বললেন, শর্ত হলো এই যে আমার শিশুকে তার বাপের কাছে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। শিশুটির গায়ে যদি একটি আচড় পড়ে তবে আমি আত্মহত্যা করবো।

একজন শ্রোতা। আহা, কী বীর নারী! সে জমানা আর নেই।

শ্রোতাগণ। তারপর?

আবদুস সাত্তার। শোন ভাই, শোন সত্য নারীর সত্য মাতার কাহিনী শোন। চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে দুঃখিনী যখন আপন শিশুর কাছ থেকে বিদায় নিলেন তখন সহসা—(পুঁথি পড়ার ভঙ্গীতে)

আসমান হইল আঁধার, বিজলী ছুটিল
নিমেষে সর্বত্র দোজখীভাব, আগুনও ধরিল।
হারাইয়া দৃষ্টিশক্তি দস্যু প্রাণভয়ে ধাবিল
খোদার কুদরতে সতীনারী সতীত্ব রাখিল॥

শ্রোতাগণ। (মুগ্ধকন্ঠে) আহা আহা!

আবদুস সাত্তার। শুধু তাই নয়—

তদোপরি সন্তান আর স্বামী ফিরিয়া পাইল।

শ্রোতাগণ। আহা, আহা।

একজন শ্রোতা। কী কাহিনী শোনালেন আবদুস সাত্তার নেওলাপুরী সাহেব!

শ্রোতাগণ। বাহ্বা, বাহ্বা!

জজ। (হঠাৎ ক্ষীপ্ত হয়ে) খামোশ খামোশ! (হাতুড়ি পেটান) খামোশ হোন সবাই। (বিচারালয় অবশেষে নীরব হলে হুকম দিয়ে) আখতারীবিবিকে সাক্ষ্য দিতে ডাকা হোক।

উকিল। না জজসাহেব, তা কী করে সম্ভব হয়?

জজ। (বিরক্তির সঙ্গে) কেন সম্ভব নয়? সাইকেলে ক'রে এখুনি সমন পাঠিয়ে দেওয়া হোক।

উকিল। না জজসাহেব, সত্যিই তা সম্ভব নয়। আখতারীবিবির বাড়ী সুদূর আরবদেশে। তাছাড়া তিনি বেঁচেও নেই। আজ আট শতাব্দী হলো তিনি এ দুনিয়ার মায়া কাটিয়ে বেহেস্তে চলে গিয়েছেন।

এক শ্রোতা। আহা! খোদা যেন তাঁকে বেহেশ্‌তেই রাখেন।

জজ। (হুঙ্কার দিয়ে) আট শতাব্দী ধরে যে ম'রে ভূত হ'য়ে আছে তার নাম ওঠে কেন?

উকিল। জজসাহেব, সে-নাম উঠেছে শুধু নজীর হিসেবে। প্রথমেই বলেছি, আসামীর বিরুদ্ধে নালিশটি অতি গুরুতর। কত গুরুতর তা সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে হলে এ-কথা প্রথমে বুঝতে হবে যে, আমাদের সমাজের ভিত্তি আইনের বইতেই সীমাবদ্ধ নয়। তার ভিত্তি সময়কাল-অতীত আমাদের মজহাব-তারীখ-আখলাকিয়াতের মধ্যে। বলুন মৌলবী আবদুস সাত্তার নেওলাপুরী, আপনার বক্তব্য খোলাসা ক'রে বলুন।

আবদুস-সাত্তার। সময়-সুযোগ পেলে আমার বলবার কোনই আপত্তি নেই। উকিলসাহেব বিজ্ঞমানুষ, আসল রগে আঙুল টিপতে তাঁর বিলম্ব হয় না। ভেবে দেখুন! কেন আমরা আজ জীবিত? কেন?

শ্রোতাগণ। কেন?

আবদুস সাত্তার। কারণ আমাদের মাজহাব-তারীখ-আখলাকিয়াত আজো জীবিত। শুধু জীবিত নয়, নদীর মত ব'য়ে চলছে, দেশে-দেশে যুগে-যুগে প্রাণসঞ্জীবিত ক'রে, বিপথগামীকে সপথে এনে, তৃষ্ণার্ত-প্রাণে বেহেশ্‌তের সুধারসের স্পর্শ দিয়ে, জাহেলের নিরাশা দূর ক'রে।

উকিল। এই বহমান নদীর ধারা শুকিয়ে গেলে জীবনে হাহাকার শুরু হবে।

আবদুস সাত্তার। সহি বাত। বিচক্ষণ উকিল সাহেব কথার মর্ম ঠিক বুঝেছেন। তবে কথা হচ্ছে, এই ধারা অনাবিল নয়। তাতে চর ওঠে, আবর্ত-নিবর্তের সৃষ্টি হয়। সে-ধারার গতি শ্লথ হয়, তার দিকও ভুল পথে মোড় নেয় কখনো কখনো। এবং তার গতিপথে যে-সব বাধা-বিপত্তি সৃষ্টি হয়, সে বাধা-বিপত্তিতে আমাদের জন্যে গূঢ় নির্দেশ রয়েছে। জজসাহেব, নজীরের উল্লেখ হয়েছে সেই জন্যেই। (জজ মাথা নাড়ে দ্রুতভাবে) আরেকটা উদাহরণ দেই তবে। (শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে) এবার শুনুন ইক্কায়েদের কথা। হিজরীর তিন শ' ছয় সালের—

হেকিম। বাহবা, বাহবা। কী তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তি নেওলাপুরী সাহেবের। ভাইসকল, আমার গুলী পরীক্ষা ক'রে দেখতে ভুলবেন না যেন। একবার চেকে দেখলে ভুলবেনও না।

আবদুস সাত্তার। হিজরীর তিন শ' ছয় সালে দামাশ্‌ক শহরে একদল মস্তিষ্ক-শূন্য লোক ফিরিঙ্গী-ইহুদির আওতায় পড়ে। একদিন তাদের নেতা ইক্কাইদ হঠাৎ প্রশ্ন তুললো, মানুষকে কোন ধার্মিক নৈতিক গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ক'রে রাখা উচিত কিনা। অনেক আলোচনা-তর্কবিতর্ক হলো। অবশেষে সিদ্ধান্ত হলো এই যে, মুক্ত মানুষই খোদার নির্দেশ দেখতে পায়। ভাগ্য ভালো, ইক্কাইদের দল ছিলো সংখ্যালঘিষ্ঠ ঃ তারা জয়লাভ ক'রে নি। তারা জয়লাভ করলে এতদিনে

আমাদের ইতিহাসের ধারা বালুচরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত, তার স্নিগ্ধশীতল পানি এই সুজলা-সুফলা দেশে এসে পৌঁছুতো না। না, আসল কথা তা নয়।

একজন শ্রোতা। (সকৌতূহলে) আসল কথা তবে কী?

আবদুস সাত্তার। আসল কথা এই যে, যখন আমরা গরু-ছাগলকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখি, সে-দড়ি দশ গজ হবে না দু-শ গজ হবে, তা নির্ভর ক'রে পড়শীর ক্ষেতের দূরত্বের উপর, গরু-ছাগলের নৈতিক উন্নতির উপর নয়। ইক্কাইদ আমাদের চিরশত্রু। তার কুমন্ত্রণা কারো কানে যেন না পৌঁছায় সে-বিষয়ে সদা সতর্ক থাকা আমাদের কর্তব্য।

জজ। (গলা হেঁকে) ডাকো ইক্কাইদকে। সাক্ষ্য নেওয়া হোক্ তার।

উকিল। (উঠে) মাফ করবেন, তা-ও সম্ভব নয় জজসাহেব।

জজ। (রেগে) কেন সম্ভব নয়? আদালত উঠতে অনেক দেরী। সমন নিয়ে সাইকেলে যাবে-আসবে।

উকিল। কী বলবো, আখতারীবিবির মত ইক্কাইদও আজ বেঁচে নেই। বেঁচে থাকলেও তাকে চটপট ডেকে আনা যেত না, কারণ সে ছিলো সুদূর দামাশ্‌ক শহরের বাসিন্দা।

জজ। (হাতুড়ি পিটিয়ে) এটা এজলাস, শুড়িখানা বা কিস্‌সাখানা নয়। সাবধান ক'রে দিচ্ছি ঃ ফালতু কথা বলে আদালতের সময় নষ্ট করবেন না।

আবদুস সাত্তার। এক কথায় আরেক কথা ওঠে। ইতিহাসের গহ্বর থেকে যাদের দৃষ্টান্ত দিয়েছি তাদের সমন দিয়ে ডেকে আনা যায় না সত্য, কিন্তু ভালো-খারাপের প্রতীক হিসেবে তারা চিরজীবিত। বস্তুতঃপক্ষে, শত-শত শতাব্দীর মধ্যে যে-দূরত্ব বা আরবদেশ, দামাশ্‌ক আর আসামীর গ্রাম নেওলাপুরের মধ্যে যে দূরত্ব, তা কেবল সময়-কালেরই দূরত্ব, মজহাব-আখলিয়াকতের অর্থে তাদের মধ্যে কোন দূরত্ব নেই।

উকিল। শুধু তাই নয়, মজহাব-আখলিয়াকতের ব্যাপারে সময়কাল অটল-অবিচল।

আবদুস সাত্তার। আমি বীরনারী আখতারীবিবির কাহিনী বলেছি, এখন শুনুন আসামীর কুকীর্তির কথা। তার বিরুদ্ধে যে-নালিশ তা পেশ করছি। তেরোই জৈষ্ঠ, সন উনিশ শ' পঞ্চাশ। নেওলাপুর নেড়া মাথার মত গাছপালা শূন্য, কিন্তু গ্রামের বাইরে জঙ্গল। অন্য একটি গ্রাম হতে সে-জঙ্গলের ধার দিয়ে বাড়ী ফিরছিলাম। তখন সন্ধ্যা হবে-হবে। হঠাৎ কানে এলো একটি মেয়েলোকের কান্নার আওয়াজ।

জজ। সন্ধ্যাকালীন সময়, জঙ্গুলে জায়গা। ভূতপেত্নী হবে।

আবদুস সাত্তার। না, ভূতপেত্নী নয় হুজুর, জ্যান্ত মেয়েমানুষ, জঙ্গলে বসে একাকী কাঁদছে

জজ। লোমহর্ষক কাহিনী। কিন্তু লোমহর্ষক কাহিনী প্রায়ই আজগুবী হয়।

আবদুস সাত্তার। না, আজগুবী নয়, নিছক সত্য।

উকিল। (হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে, আসামীর দিকে তাকিয়ে) বলো আমেনা, বলো। নেওয়াপুরের পাশে জঙ্গলের মধ্যে বসে তুমি সে-দিন কেন কাঁদছিলে? কেনইবা তোমার কোলে ছিল একটি দেড় বছরের মৃত শিশু?

জজ। বাঘ-ভাল্লুকের ব্যাপার হবে। তারপর?

আবদুস সাত্তার। না, নেওলাপুরে বাঘভাল্লুক কোথায়? (পুথি পড়ার সুরে)—

শোন ভাই, শোন সবে, শোন মন দিয়া
শুনিলে কাঁদিবে সবাই, কাঁপিবে হিয়া
খোদা আছে রূপ আছে আছে আপনজন
তবু না মানে নারীর কঠিন পরাণ
নিজহাত বধিল সে আপন সন্তান ॥

অল্পবয়স্ক বই বিক্রেতা। (শ্রোতাদের মধ্য থেকে লাফিয়ে ওঠে, হাতে এক গাদা পাতলা ধরনের বই। একটি বই তুলে ধ'রে চীৎকার করে) সদ্য বের হয়েছেঃ নিষ্ঠুর হত্যাকারিণীর কাহিনী! উত্তম ছাপা, ঝর ঝরে নির্জল ভাষা। একবার পড়তে শুরু করলে শেষ না ক'রে পারবেন না। বাড়ীতে বাপদাদা নাতিপুতি সবাই উদগ্রীব হ'য়ে পড়বে। সবাই আমোদিত রোমাঞ্চিত হবে। বিবাহের উপহারের জন্যও উপযোগী। দাম মাত্র ছয় আনা। কিনতে বিলম্ব করবেন না। নিষ্ঠুর হত্যাকারিণীর কাহিনী!

(শ্রোতাদের মধ্যে আলোড়ন। কেউ কেউ বই কেনে। বিক্রেতা বিক্রি করে।)

জজ। (বিক্রেতাকে, অত্যধিক গাম্ভীর্য দিয়ে লজ্জা ঢেকে) দেখি, এদিকে এক কপি। (বিক্রেতা বেঞ্চি ডিঙ্গিয়ে জজের দিকে ছুটে যাবে।)

আবদুস সাত্তার। (পুথি পড়ার সুরে)—

ইয়াদ করো নেক নারী আখতারীর কথা
খোদা-পয়গম্বরে রাখো মন সদা-সর্বদা!

(কেউ কান দেয় না। যুবক, আবদুস সাত্তার, উকিল, কেরানী এবং বই-বিক্রেতা ছাড়া সকলেই সদ্য-কেনা বইতে ডুবে যাবে। যারা কেনেনি, তারা প্রতিবেশীর ঘাড়ের ওপর ঝুঁকে পড়বার চেষ্টা করবে। একটি পুলিশও শেষোক্ত দলে জুড়ে যাবে। আবদুস্ সাত্তার এবং উকিল একত্র হ'য়ে আলাপ করবে নিম্ন গলায়। যুবক উঠে দাঁড়িয়ে কয়েক মুহূর্ত মঞ্চের সামনে অস্থির-ভাবে পায়চারি করে ভিখারিণীর পাশে পায়ের গোড়ালীতে ভর ক'রে বসবে, কিন্তু তাকে ভিখারিণীর অস্তিত্ব সম্পর্কে সজ্ঞান মনে হবে না। তবে মুখে বিহ্বলতা।

যুবক। (আপন মনে নিম্নগলায় কিন্তু অধীর ভাবে) কিছুই বুঝতে পারি না। জীবনের সংগ্রামে যারা হেরে যায়

তারাই অবশেষে কাঠগড়ায় এসে দাঁড়ায়। কিন্তু কেন তারা হারে ? উত্তর জানতে আসি বিচারালয়ে, কোনই উত্তর পাই না।

ভিখারিণী। (কৌতুকের সঙ্গে যুবকের দিকে তাকায়; যুবক লক্ষ্য করে না।)

যুবক। (একটু থেমে) কেন আমার জানবার এত ইচ্ছা, কেনই বা এত কৌতূহল ? কিন্তু মনে হয়, এ কৌতূহলের জন্মস্থান যেন নিদারুণ ভীতির মধ্যে। আসলে আমার মনে ভয়ের শেষ নেই। হয় তো জীবন সংগ্রামে যারা হেরে গেছে তাদের দেখে মনে যেন সাহস সৃষ্টি ক'রতে চাই। অথবা জানতে চাই কোথায় সে-সীমারেখা যার একধারে জয়, অন্যধারে পরাজয়। অথবা যাঁরা ন্যায়-অন্যায়ের বিচারের দণ্ড বহন করেন তাঁদের দেখে মনে শক্তি পেতে চাই। কিন্তু কিছুই বুঝি না।

ভিখারিণী। (হেসে) কী বোঝ না ?

যুবক। (চমকিত হয়ে ভিখারিণীকে প্রথমবার দেখে) ও ! না, কিছু না।

ভিখারিণী। লজ্জার কী ? বলো আমাকে। জীবনে আমি অনেক দেখেছি, অনেক শুনেছি। আমাকে বলতে দ্বিধা করো না।

যুবক। (ইতস্ততঃ করে বলতে রাজি হয়ে) ধর এই আসামী। নিজের সন্তানের প্রাণ নিয়েছে বলে আজ তার প্রতি কারো কোন মমতা নেই। কেউ আজ জানতে চায় না কেন সে এমন নির্মম, অমানুষিক কাজ করেছে। আমিও তাকে ঘৃণা করতে চাই। কিন্তু আশ্চর্য, মনে ঘৃণা আসে না। ঘৃণার বদলে জাগে সেই কৌতূহল। কেন, কেন সে এমন নিষ্ঠুর কাজ করেছে ?

ভিখারিণী। কেন কাজটি করেছে তা বড় একটা রহস্যের কথা নাকি ? অতি দরিদ্র মেয়ে। স্বামী বেঁচে নেই, কোন রোজগারের পথ নেই, অথচ ঘাড়ে চার-চারটে সন্তান। একদিন সহ্য না

করতে পেরে কোলের শিশুটাকে গলা টিপে মেরে ফেলে। বলতে গেলে নেহাৎ সাধারণ ঘটনা।

যুবক। (বিস্মিত হয়ে) কিন্তু চারধারে এমন সাজসরঞ্জাম, এমন কুটবুদ্ধির লীলাখেলা কেন?

ভিখারিণী। তোমার বুঝি বড় কৌতূহল?

যুবক। (লজ্জিত ভাবে) না না, কৌতূহল নয়।

ভিখারিণী। (ঈষৎ ব্যঙ্গ করে) না কৌতূহল নয়, চরম উদাসীনতা। শোন, দুই দলের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়েছে। তবে আসামীকে নিয়ে নয়।

যুবক। (বিস্ময়ে) আসামীকে নিয়ে নয়তো তবে কাকে নিয়ে?

ভিখারিণী। তুমি একটুতেই অবাক হও বুঝি?

যুবক। (সলজ্জিত ভাবে প্রতিবাদ ক'রে) না না, অবাক হব কেন?

ভিখারিণী। আগে বলো একটি কথা। দুই দলের মধ্যে কোন দলের দিকে তোমার টান?

যুবক। (ইতস্ততঃ করে অনিশ্চিত কন্ঠে) জজের দিকেই যেন। (থেমে) কিন্তু মনে হয় তিনি বড় ধূর্ত!

ভিখারিণী। ধূর্ত মানুষকে তোমার বড় ভয় নাকি?

যুবক। (সলজ্জিতভাবে) না না, ভয় নয়।

ভিখারিণী। কিন্তু ধূর্ত না হয়ে উপায় কী? ধূর্ত না হলে যেমন অসৎ কাজ করা যায় না, তেমনি সৎ কাজও করা যায় না। বুঝলে এবার?

যুবক। (মাথা নেড়ে বোঝায়, সে বুঝেছে।)

ভিখারিণী। কলা বুঝেছ। বুঝিয়ে বলছি, শোন। ধূর্ত হোক, কি একদল সাধু, অন্যদল অসাধু। তবে কোন্ দল সাধ কোন্ দল সাধু নয় তা সহজে বোঝা মুশকিল। কেন জানো?

যুবক। (এবার কোন উত্তর দিতে সাহস পায় না। নীরবে প্রশ্নকারিণীর দিকে তাকিয়ে থাকে।)

ভিখারিণী। কারণ, দু-দলেই মুখোশ পরেছে। না পরে উপায় কী? (যুবক হঠাৎ ভাবিত হয়ে পড়ে তা লক্ষ্য করে) কী হলো?

যুবক। কে জিতবে?
(ভিখারিণী সকৌতুকে তাকায় তার দিকে, কিন্তু উত্তর দেবার সময় পায় না। মঞ্চে শ্রোতাদের মধ্যে সহসা চঞ্চলতা দেখা দেয়।)

একজন শ্রোতা। (চীৎকার করে) অমানুষিক নিষ্ঠুরতা!

দ্বিতীয় শ্রোতা। বীভৎস! বীভৎস!

তৃতীয় শ্রোতা। (তীব্রবেগে উঠে দাঁড়িয়ে আসামীর দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে হিংস্রকন্ঠে) আসামীর ফাঁসী চাই! আসামীর ফাঁসী চাই!

কয়েক শ্রোতা। (হাতের পুথি নেড়ে) ফাঁসী! ফাঁসী চাই! (শ্রোতাদের মধ্যে আলোড়ন: কিছুক্ষণের জন্যে সে-আলোড়ন তুমুল হয়ে উঠবে।)

জজ। (মুখ তুলে এধার-ওধার তাকান, ব্যাপারটা যেন বুঝতে পারেন না) কিসের এত গোলমাল! (হাতড়ি পেটান।)

একটি শ্রোতা। জজ সাহেব, আসামীর ফাঁসী চাই।

কয়েকজনশ্রোতা। আসামীর ন্যায্য বিচার চাই!

জজ। (হাতুড়ি পিটিয়ে, রাগতভাবে।) খামোশ; খামোশ। এটা আদালত, হাটবাজার নয়। চুপ হোন্ সব। (আওয়াজ থামে) তারপর? আসামীর নামে কী নালিশ?

উকিল। সন্তান হত্যার।

জজ। (পূর্ব্ববৎ রাগতভাবে) সে-ই এক কথা, কিন্তু কোথায় সাক্ষী সাবুদ ?

আবদুস সাত্তার। (উঠে) আমি সাক্ষী।

জজ। কী বক্তব্য আপনার ?

আবদুস সাত্তার। নেওলাপুরের পার্শ্বস্থিত এক জঙ্গলের মধ্যে থেকে যখন একটি মেয়েলোকের কান্না কানে এলো তখন ভেতরে ঢুকে দেখি আসামী ব'সে কাঁদছে, তার কোলে একটা মৃত শিশু।

জজ। কার শিশু ?

আবদুস সাত্তার। আসামীরই গর্ভজাত শিশু। সে পরিষ্কার গলায় বললো, সে তার বাচ্চাকে গলা টিপে মেরে ফেলেছে। যখন দেখলাম সত্যিই শিশুর জান নেই তখন আমি রাগে কাঁপতে শুরু করলাম। পরে দিলে হঠাৎ ভয়ও হলো। মনে হলো, আমি যেন শয়তানের সামনে দাঁড়িয়ে, যে-শয়তান খোদার সৃষ্টিকে নিয়ে মস্করা ক'রে। প্রথমে যখন রাগ হয়েছিলো তখন মনে হয়েছিলো সমস্ত জঙ্গলটা যেন ধাঁ ক'রে জ্বলে উঠবে। এবার এমন ভয় পেলাম যে মনে হলো, গাছপালা মাঠঘাট হিমশীতল হ'য়ে যাবে। শুনছেন জজসাহেব ?

জজ। (ছাদের দিকে তাকিয়ে) শুনছি, শুনছি !

আবদুস সাত্তার। আমি প্রাণভয়ে দৌড়তে লাগলাম। দু-শ গজ গিয়েছি এমন সময়ে শুনতে পেলাম আসামীর অমানুষিক হাসির আওয়াজ। জজসাহেব, জীবনে এমন হাসি কোনদিন শুনি নি।

জজ। হুঁ হুঁ ! তারপর ?

আবদুস সাত্তার। কানে আঙ্গুল দিয়ে দোয়াদরূদ পড়তে পড়তে দৌড়তে লাগলাম। বাড়ী পেঁ ছার আগে থামি নি।

শ্রোতাগণ। (সমস্বরে তালে-তালে) আসামীর ফাঁসী চাই। আসামীর ফাঁসী চাই। আসামীর ফাঁসী চাই!

উকিল। (দাঁড়িয়ে হাত তোলে, আওয়াজ থামে) আসামীর বাড়ী থেকে জঙ্গলটি দেড় মাইল। শিশুকে বুকে ক'রে সে-দূরত্ব অতিক্রম ক'রে আসামী যখন জঙ্গলে ঢোকে, সূর্য তখনো অস্ত যায়নি। সন্ধ্যার জন্যে আসামী অপেক্ষা করতে থাকলো। হয়তো তখনো তার মধ্যে এইটুকু মনুষ্যত্ব বাকী ছিলঃ দিনের আলোয় এমন হীন কাজ করতে তার হাত ওঠে নি।

আবদুস সাত্তার। জঙ্গলের মধ্যে মরা-বাচ্চা কোলে নিয়ে সে যখন বসেছিলো তখন তার বুকে কাপড় ছিলো না। বে-শরমের মত খোলা বুকে বসেছিলো।

ভিখারিণী। (হেসে উঠে) গলাটিপে মারার আগে শিশুকে শেষবার দুধ দিতে চেয়েছিলো। কিন্তু শুষ্ক স্তন থেকে এক ফোঁটা দুধ আসে নি।

উকিল। না। শিশুকে দুধ দিচ্ছিল যাতে মরবার সময় তার মুখ থেকে কোন আওয়াজ বের না হয়।

শ্রোতাগণ। (সমস্বরে, তালে-তালে) ফাঁসী চাই, ফাঁসী চাই।

উকিল। (আবার হাত তোলে, আওয়াজ থামে) আরেকটা কথা আপনার কাছে পেশ করতে চাই, জজসাহেব। আসামী তার এই হীনতম দুষ্কর্মের কথা একবারও অস্বীকার করে নি।

জজ। হুঁ। (আসামীর দিকে তাকিয়ে) আসামীর কী ব্যক্তব্য ?

ভিখারিণী। (দর্শকের দিকে তাকিয়ে) তার আবার বক্তব্য কী? না, তার কিছুই বলার নেই। সে চায় আইনের উচচতম শাস্তি, যাতে সে তাঁর মৃতশিশুর সাথে মিলিত হ'তে পারে।

এ-দুনিয়ার ওপারে, যেখানে সব দুঃখ-কষ্ট জ্বালা-যন্ত্রণার শেষ হয়।

জজ। (ভুল ক'রে) কী বললো আসামী?

উকিল। কিছু না, জজসাহেব। তার বলার কিছু নেই।

জজ। সে না বলুক, কে আছে তার পক্ষ থেকে কিছু বলবে? আমি বিচারক। সুবিচার আমার কর্তব্য। (চার ধারে চেয়ে) কে আছে তার সমর্থনে দু-টি কথা বলবে?

শ্রোতাগণ। (নির্বাক)

উকিল। নিষ্ফল চেষ্টা, কেউ নেই। আপনি সব জানেন, জজসাহেব। কী ক'রে তার পক্ষ থেকে কেউ কিছু বলে? তার মত গুনাহ্‌কারীর সমর্থনে কে বা কী বলতে পারে? দারিদ্র্যই যদি সন্তানহত্যার কারণ হয়ে থাকে, তবু তার অপরাধ কোনপ্রকারে লঘু নয়। কারণ তাতে এই প্রমাণ পায় যে, সে যে শুধু সৃষ্টিকর্তার অপরিসীম দয়ামায়ার প্রতি পরম অবিশ্বাস দেখিয়েছে তা নয়, তাঁর দয়ামায়াকে তাচ্ছিল্যও করেছে।

আবদুস সাত্তার। আরেকটি কথা ভেবে দেখবেন, জজসাহেব। খোদাতালার ক্ষমার শেষ নেই। তাই এমন গুনাহ্‌কারী নেই যে অনুতপ্ত চিত্তে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইতে পারে না। কিন্তু কাঠগড়ায় যে-নিষ্ঠুর নারী দাঁড়িয়ে, সে অনুতপ্তও নয়, মাফ চাইতেও প্রস্তুত নয় সে।

উকিল। আমাদের অনুরোধ, রায় দিতে আর দ্বিধা করবেন না। আসামীর সুবিচার না হলে তার ভীষণ পরিণাম হবে জজসাহেব!

জজ। (রেগে) জানি জানি! জজকে জজিয়তি শেখাবেন না! (হাতের পুথিটি দেখিয়ে) এই পুস্তিকায় পরিণামের কথা সব লেখা আছে। শাস্তি না হ'লে সমাজে কী মহা বিপর্যয় ঘটবে সব নির্জলভাষায় বলা হয়েছে। ভাবনার

কারণ নেই। আসামীর শাস্তির পরিমাপ করার ক্ষমতা আমার আছে। তার ন্যায্য শাস্তি হবে।

আবদুস সাত্তার। (দাড়িতে হাত বুলিয়ে, সজোরে) শোকর আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌ !

জজ। তবে দেরী হবে। চট্‌ করে কী রায় দেওয়া যায়? কিছু দেরী হবে।

উকিল
আবদুস
সাত্তার } (সমস্বরে) আবার দেরী !

শ্রোতাগণ। (হতাশার আওয়াজ করে।)

উকিল। কেন দেরী হবে জজসাহেব? মামলার খুঁত কোথায়? নালিশের যথার্থতার ব্যাপারে বলুন, সাক্ষীর সত্যাসত্যের ব্যাপারে বলুন, কোথাও একটু অসংলগ্নতা নেই। তবে কেন দেরী হবে?

জজ। (দুঃখের সঙ্গে, আপন মনে) না, কোনই খুঁত নেই।

উকিল। (আশান্বিত হ'য়ে) আপনি নিজেই স্বীকার করছেন কোন খুঁত নেই। আর তাহলে বিলম্ব করবেন না, জজসাহেব।

জজ। (শুধু মাথা নেড়ে, দৃষ্টি টেবিলের উপর রেখে) জজকে তাড়া দেবেন না। জজের দায়িত্ব অনেক।

উকিল। কী বলি জজ সাহেব, জনমতের কথাও খেয়াল করবেন। লোকেরা কানাঘুষা করতে শুরু করেছে যে আপনি আসামীকে শাস্তি দিতে চান না। তাদের মনে কেমন সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। তারা এ কথাও বলতে শুরু করেছে যে আপনার বিচারে খুঁত ধরেছে। আপনার সুনামের কথা ভাবুন।

জজ। (আপন মনে) শুধু বিচার যে করতে হয় তা নয়, বিচারককে জনমত আর সুনামের কথাও ভাবতে হয়।

উকিল। ভাবতে হবে বৈকি। বিচারের কর্তব্য অন্যায়-অবিচার থেকে সমাজ ও ধর্মকে রক্ষা করা। আপনার বদনাম হ'লে চলে কী ক'রে?

জজ। (নিরুৎসাহ কন্ঠে) বদনাম। আমার বদনাম হয়েছে। (কেরাণীর দিকে চেয়ে) কি হে, শুনেছ এমন কথা? (কেরাণী কাগজ-পত্রে মাথা নীচু ক'রে রাখে। একটু অপেক্ষার পর) তুমি কী ক'রে শুনবে? সরকারী কাগজ-পত্র দিয়ে কানে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে রাখো, শুনবে কী ক'রে? (উকিলের দিকে তাকিয়ে) বলেছি না, ভাবনার কারণ নেই। আমার হাত-পা বাঁধা, সুবিচার হবেই। শুধু ভাবছিলাম—কী ভাবছিলাম? (হঠাৎ ভাবনাগ্রস্ত হয়। উপরের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করতে শুরু ক'রে। মনে হয় এ-দুনিয়ায় আর যেন নেই। মঞ্চে সকলে স্তব্ধভাবে তাকিয়ে থাকে তাঁর দিকে। ক্রমশ তাঁর মুখ ক্রোধাচ্ছন্ন হ'য়ে উঠে। হঠাৎ চোখ খুলে সজোরে টেবিল চাপড়ে) না না, না! (আবার বিড়বিড় করে।)

ভিখারিণী। (মাথা নেড়ে) আইন-কানুনের জালে মাছের মত আটকা পড়ে জজের প্রাণ ধড়ফড় করছে। পালাবার পথ নেই।

যুবক। (হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে সহানুভূতির কন্ঠে) জজসাহেব! জজসাহেব!

শ্রোতাগণ। (ভেঙ্গিয়ে) জজসাহেব! জজসাহেব!

জজ। (শোনে না। বিড়বিড় করা বন্ধ হয়েছে। চেয়ারের পিছনে মাথা হেলানো, দৃষ্টি নিমীলিত।)

যুবক। (শ্রোতাদের দিকে তাকায়, মুখে বিহ্বলতা। তারপর ব'সে পড়ে।)

ভিখারিণী। তারপর সূর্য ডুবে যায়, আকাশে চাঁদ ওঠে, ধানের ক্ষেতে ম'রে যায় হাওয়া: বিশ্বভূমণ্ডলে আপন-আপন চক্রপথে

ঘুরতে থাকে নীরবে। আবার চাঁদ ডুবে যায়, পূর্ব আকাশে ওঠে সূর্য, হাওয়া জাগে বলে ধান ক্ষেতে আন্দোলন হয়; সহস্র চক্রপথে বিশ্বভূমণ্ডলের গতি শ্লথ হয় না, দিক্‌ভ্রষ্ট হয় না। কিন্তু প্রাণ ধড়ফড় করে গো, প্রাণ ধড়ফড় করে। কেউ কোথাও নেই যে আসামীর পক্ষ থেকে একটি কথা বলবে। এত নিঃসঙ্গ মানুষের উপর মৃত্যুর রায় দিতে হাত ওঠে না সহজে। কিন্তু কে বোঝে মনের ব্যথা, কোথায় বা কে উত্তর দেয়?

মতলুব আলী। (উঠে সন্তর্পণে) জজসাহেব!

উকিল। (ধমক দিয়ে) আপনার আবার কী দরকার? জজসাহেবকে ব্যাঘাত করবেন না।

ভিখারিণী। মাছ জালে পড়েছে। তাকে খুঁচিয়ে আর লাভ কী?

উকিল। ব'সে পড়ন!

মতলুব আলী। (সন্ত্রস্তভাবে উকিলের দিকে একবার তাকিয়ে) জজসাহেব!

শ্রোতাগণ। (ভেঙ্গিয়ে) জজসাহেব!

মতলুব আলী। (উপেক্ষা ক'রে আবার সন্তর্পণে) জজসাহেব! আমার নাম মতলুব আলী। আমি আপনার একজন ভক্ত। আপনার বিচারকার্যে কিছু সাহায্য করতে পারলে আমার আনন্দের সীমা থাকবে না। আপনার অনুমতি পেলে আসামীর পক্ষ থেকে দু'টি কথা বলবো। জজসাহেব!

জজ। (উত্তর দেয় না। তার চোখ পূর্ববৎ নিমীলিত।)

উকিল। (সজোরে) বললাম না ব'সে পড়ন!

মতলুব আলী। (একবার উকিলের দিকে তাকিয়ে কিছুটা ভীতকণ্ঠে) আসামী অবশ্য আমার কেউ হয় না। তাকে চিনিও না। আমি একজন কনট্রাক্টার। তাহলে খুলেই বলি। গত-যুদ্ধের গোড়াতে কিছু পয়সা করেছিলাম। আমার প্রাপ্য

অবশ্য বিলেই আটকে আছে, বিল পাশ হয় না। এক গাদা বিল। সামান্য যা নগদ পেয়েছিলাম তা তিন মেয়ের বিয়েতেই খরচ হ'য়ে গেছে। অবশ্য তাদের বিয়ে শান-শওকাতেই দিয়েছিলাম।

উকিল। আপনার বিলের বা মেয়েদের বিয়ের কথা শোনবার সময় নেই আদালতের।

মতলুব আলী। কিন্তু চারিদিকে বড় ঋণধার হয়েছে। হুজুরের যদি উপকার করি তবে আপনি নিশ্চয় আমার প্রতি দয়া করবেন। আপনি একটু বললে, একটু সুপারিস করলে পাশ হ'য়ে যাবে। আমি আসামীর পক্ষ থেকে কিছু বলবো। তাকে চিনি না, কিন্তু দু-টি কথা বলবো তার পক্ষ থেকে।

আবদুস সাত্তার। (উকিলকে) পাগলে কী না বলে ছাগলে কী না খায়। কে না চেনে মতলুব আলীকে, ঘাটে বাটে কে-ই বা তার ফজুল বিলের কথা শোনে নি বছরের পর বছর?

উকিল। (ইঙ্গিতে মাথায় আঙুল দিয়ে বার-কয়েক টোকা দিয়ে বোঝায়, মতলুব আলীর মাথা খারাপ।)

মতলুব আলী। (জজের নীরবতায় কিছুটা উৎসাহিত হ'য়ে) কসম খেয়ে বলছি, বিলের কথা তুলবো না। বিল যাক্ চুলায়। আজই আগুন লাগিয়ে দেব বিলে। তাছাড়া, সত্য কথা লুকিয়ে লাভ কী, বিলগুলোতে ভুলচুক যে নেই তা নয়। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে সবাই চুরি-চামারী করে। করতেই হয়। না করলে দেখতে-না-দেখতে ভিটে-বাড়ী নিলামে উঠে যায়। কাজেই জেনেশুনে ভুলচুক কিছু করেছি যোগ-বিয়োগে আমারই লাভের জন্যে। তবে আপনি যদি সে-বিলগুলো পাস করিয়ে দেন তবে ওয়াদা করছি এতিম-মিসকিনের কথা ভুলবো না, দাতব্য অনুষ্ঠান-আঞ্জুমানের বাক্সেও চোখ বুজে কিছু পয়সা দিয়ে দেবো।

আবদুস্ সাত্তার। (শ্রোতার দিকে চেয়ে মতলুব আলীকে অনুকরণ করে) আর যারা বাঁ হাতে রোজগার করে তাদেরও ভুলবো না, জজসাহেব।

শ্রোতাগণ। (উচ্চস্বরে হাসে।)

মতলুব আলী। জজসাহেব, এদের হাসিতে কান দেবেন না। এ-আদালতে আপনার যদি কেউ সত্যিকার ভক্ত থাকে তবে আমিই সে-ভক্ত। আমার চোখে আপনি দরিদ্রের রক্ষাকর্তা, নিগৃহীতের পরিত্রাতা। আপনাকে সাহায্য করতে পারলে নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান মনে করবো। জজসাহেব! (জজ পূর্ববৎ। শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে কিন্তু আপনমনে) কেন যে এত সৌভাগ্যবান মনে করবো তা বলতে হ'লে ছেলেবেলার কথা বলতে হয়। দাদার আমলে বিক্রমপুরে সামান্য জমাজমি ছিলো। বন্যাতুফান বা খরার দিনেও ধান-চাল শাক সব্জীর কমাই ছিলো না, পুকুরে মাছের অভাব হতো না। দাদা ছিলেন মূর্খ প্রায়, কেবল গোঁ-গোঁ ক'রে কোরান পড়তেই জানতেন। কিন্তু দাদীর খেয়াল ছিলো নানাদিকে। তিনি কেবল বলতেন, পড়, ভালো ক'রে পড়, তবেই তো জজ হবি। সে জমিজমাও আজ নেই, জজও বনতে পারিনি। ঘরের কথা কী বলি, অবস্থা বড়ই খারাপ। আসলে বিলগুলো ছাড়া আর কিছুই নেই। কিন্তু সুপারিশ ছাড়া কিছুই হয় না এ-দুনিয়ায়। (কী ভেবে থামে, মুখে দুঃখের ছায়া। কথার যেন খেই হারিয়ে ফেলে। তারপর সচতেন হ'য়ে) কী বলছিলাম? হ্যাঁ। শান-শওকাতে বিয়ে দিলাম তিন্ মেয়ের। কিন্তু জামাইগুলো কি আমার খোঁজ খবর নেয়? বিলগুলি যদি একবার পাস করাতে পারতাম তবে তাদের পরওয়াই করতাম না।

শ্রোতাদের একজন। (ফিক্ ক'রে হেসে) বিলের কথা বলবো না, জজসাহেব।

আরেকজন শ্রোতা। (গম্ভীর ভাবে) গত যুদ্ধের বিল আগামী যুদ্ধে পাশ হবে; আশা ছাড়বেন না।

শ্রোতাগণ। (সমস্বরে হাসে)

মতলুব আলী। (কিছুটা লজ্জিত হ'য়ে) আবার সেই বিলের কথা বলতে শুরু করেছি। (সংযত হ'য়ে আসামীর দিকে চেয়ে) আমি দাঁড়িয়েছি আসামীর পক্ষ থেকে দু'টি কথা বলবার জন্যে। নাম তার আমেনা, বাড়ী নেওলাপুর। আজ সে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছে আপন সন্তানের জান নেবার অপরাধে। সবাই জানে সে-কথা। আমি-ও জানি। কিন্তু কী বলি। (একটু ভাবে, তারপর কেমন আত্মবিস্মৃত হ'য়ে পড়ে) আসল কথা, আমার মনে আর ভাবদরদ নেই, ভেতরটা যে ধূ ধূ প্রান্তর। থেকে-থেকে একটা অন্ধ ঝড় ওঠে, কিসের ঝড় তাও বুঝি না। কিন্তু তার জ্বালা অসহ্য। সত্য কথা কী, দুনিয়ায় এত মানুষ, এত দুঃখ, কিন্তু আমি আজ কারো দিকে তাকাই না। চোখ আছে কিন্তু সে-চোখ দিয়ে কিছু দেখি না। দৃষ্টিশক্তি আছে তবু আজ আমি অন্ধের মত। কী ক'রে অপরের কথা বলি ‘? (ভাবাচ্ছন্ন ভাবে থামে। তারপর) আমেনা! আমেনা কে? আমার সামনে সশরীরে দাঁড়িয়ে আছে, তবু হলফ ক'রে বলতে পারি কি আমি তাকে দেখতে পাই? (হঠাৎ জজের দিকে তাকিয়ে) জজসাহেব! (জজের চোখ নিমীলিত থাকে)

শ্রোতাগণ। (ঠাট্টা ক'রে) জজসাহেব।

মতলুব আলী। (ঠাট্টা উপেক্ষা ক'রে) জজসাহেব, আজ আমাকে বলতেই হবে। এ-সুযোগ কী ক'রে ছাড়ি। (হঠাৎ উত্তেজিত হ'য়ে ওঠে) আজ আমাকে বলতেই হবে সে-বীভৎস ছায়ার কথা। সে-ছায়াই আমাকে অন্ধ করে তুলেছে আর আমার হৃদয়কে নারকেলের ছোব্ড়ার মত রসশূন্য করেছে। তার কথা স্পষ্টস্বরে কোনদিন বলিনি। (কেঁপে ওঠে) তার চেহারা ভয়ানক, তার ক্রোধও ভয়ানক। (আবার জজের দিকে তাকিয়ে, ব্যাকুল ভাবে) জজসাহেব! জজসাহেব! আমাকে শুধু দু-টি মিনিট

সময় দিন, আমাকে সে-বীভৎস ছায়ার কথা বলতে দিন। গোপনে পীর-তাবিজ-দরগাহ্ অনেক করেছি, কিন্তু তার কথা কখনো কাউকে বলিনি। (জজের চোখ পূর্ববৎ নিমীলিত থাকে। মতলুব আলী মন্ত্র-মুগ্ধ মানুষের মত ধীরে ধীরে মঞ্চের সামনে এগিয়ে আসে। তার চোখ জ্বল জ্বল করে। যে-অংশে সে দাঁড়াবে, সে-অংশ ছাড়া গোটা মঞ্চ ক্রমশঃ অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে।) আজ তার কথা বলবো।

ভিখারিণী। (অন্ধকার থেকে) বল মতলুব আলী, বল নির্ভয়ে।

মতলুব আলী। (স্মৃতিভরা কন্ঠে) একদিন আমি ছায়াশূন্য ছিলাম। মনে হয় বহুদিন আগে। তারপর সেই ছায়া এলো, হঠাৎ, শূন্য মাঠে ঘূর্ণি ওঠার মত প্রথমে আমার আশে-পাশে ঘোরে, সাহস নেই যে ঝট ক'রে আমাকে ছোঁয়। তখন আমার যেমন তাকে ভয়, তারও তেমনি আমাকে ভয়। তারপর একদিন আমার হার হলো। যেদিন সে আমার ভেতর প্রবেশ করলো, সেদিন অদ্ভুত একটা তৃপ্তিও পেলাম। কখনো-কখনো ভাবি, কে কাকে গ্রহণ করেছে? সে-বীভৎস ছায়া আমাকে গ্রহণ করেনি, আমিই তাকে গ্রহণ করেছি। জজসাহেব, বগলে বিল নিয়ে যে ঘাটে-বাটে পাগলের মত ঘোরাঘুরি করি, সে-টা আমার বাইরের চেহারা। সেটা সমাজে বাস করার ছাড়পত্র শুধু। কিন্তু ভেতরের চেহারা ভিন্ন। ভেতরে আমি আর মানুষ নেই। জজসাহেব! আপনার প্রতি আমার অশেষ ভক্তি আছে বলেই আরেকটা কথা বলবো। একটা অদ্ভুত কথা। কেউ কোথাও ঘৃণ্যতম নিষ্ঠুর কাজ করলে, তাকে চিনি কী না চিনি, মনে হয় আমি যেন তার পিছনে ছিলাম, তাকে সে-কুকার্যে উৎসাহ দিয়েছিলাম, তাকে সাহায্য করেছিলাম।

ভিখারিণী। সেদিন নেওলাপুরের জঙ্গলেও কী তুমি ছিলে মতলব আলী?

মতলুব আলী। (কথাটা ভেবে দেখে; মনে আলোড়ন। তারপর) আশ্চর্য, সে-কথাই ভাবছিলাম। কিন্তু বলতে সাহস হয় নি। আমেনাকে চিনি না, কিন্তু তবু মনে হয় সে-সন্ধ্যায় তারই সঙ্গে যেন ছিলাম।

ভিখারিণী। শুরু থেকে সব খুলে বলো মতলুব আলী, আর নির্ভয়ে বলো। কেউ তোমাকে ফাঁসি দেবে না। শোন, তোমাকে মনে করিয়ে দেই। সেদিন দুপুর বেলা উঠানে বসে আমেনা, পাশে চার সন্তান ট্যাঁ-ট্যাঁ করছে ক্ষিধেয়। সে গিয়েছিলো মিঞাদের বাড়ীতে কাজের খোঁজে। কিন্তু মিঞাদের বাড়ীতে কাজ নেই। আজও নেই কালও নেই। মিঞার বিবি নাকের নথে 'ঝট্‌কা দিয়ে বললো, না গো বেটি, তোমার কোরের এইটুকুন বাচচা কেঁদে কেঁদে জান খেয়ে ফেলবে, বড় ছেলে-মেয়েগুলো ঘরে-বাইরে ছুটোছুটি ক'রে পাগল বানিয়ে দেবে। তুমি তাদের সামলাবে না কাজ করবে। শেষ বারের মত আমেনা হয়তো বলছিলো, কাজ না দিলে না খেয়ে যে মারা যাব ছেলেমেয়ে নিয়ে। উত্তর না পেয়ে অবশেষে বলেছিলো, আজ অন্তত চারটে চা'ল দিন। মিঞার বিবি ঝামটা দিয়ে বললো, অনেক দিয়েছি, কিন্তু দেয়ার একটা সীমা আছে। আর দিতে পারি না। উঠানে বসে সে-কথাই ভাবছিলো আমেনা। হঠাৎ তখন উঠান অতিক্রম ক'রে এসে কে তাকে কানে-কানে বলেছিলো, আমেনা, আমি যা বলি তাই কর। কে বলেছিলো সে কথা ?

মতলুব আলী। (সভয়ে) কে ? কে বলেছিলো সে-কথা ?

ভিখারিণী। কে বলেছিলো, চল যাই আমেনা, পুকুরের ধার দিয়ে, করিমউদ্দিনের ক্ষেতের পাশ দিয়ে, আমিরুদ্দিন পোদ্দারের বাঁশঝাড়ের মধ্যে দিয়ে গ্রামের বাইরে সে-জঙ্গলে। কেউ জানবে না, কেউ দেখবে না।

মতলুব আলী। কে, কে ? (অতিশয় ভীত মনে হয়।)

ভিখারিণী। কে বলেছিলো, চল আমেনা, অন্ততঃ একটা সমস্যার সমাধান কর। কত আর সহ্য করা যায়। আরগুলোকেও শেষ করতে, কিন্তু তারা যে হাঁটে, কথা বলে, মাকে চেনে। ছোটটা এখনো অবুঝ। কিছু বোঝে না, তাই জানবেও না কিছু।

শ্রোতাগণ। (সমস্বরে) কে, কে বলেছিলো ?

ভিখারিণী। আমেনা বললো, এইটুকুন বাচ্চা, বুকে আমার দুধ নেই তবু সে দুধের বাচ্চা, আমার আদরের ধন। কি ক'রে করি। উত্তরে কে বলেছিলো, নিস্পাপ শিশু খোদার কাছেই ফিরে যাবে। তোমার গুনাহ্ হবে, তুমি দোজখে যাবে, কিন্তু তার কষ্টের শেষ হবে।

শ্রোতাগণ। কে, তার নাম বলো ! তার নাম চাই !

ভিখারিণী। আমেনা বললো, আমি দোজখের আগুনকে ভয় করি না। আমার বাচ্চার দুঃখ-কষ্ট যদি শেষ হয় আমি দোজখেও যেতে রাজি।

শ্রোতাগণ। আহা, কী দুঃখের কথা !

ভিখারিণী। ঘরে ছিলো কানা মা, অন্ধকার কোণে বাতের ব্যথায় গোঁ-গোঁ করছিল। আমেনা তিন ছেলেমেয়েকে বললো, তোরা খেলা কর্, আমি মিঞাদের বাড়ীতে ঢেঁকি মাড়িয়ে আসি। দুধের বাচ্চাকে বুকে চেপে সে বেরিয়ে গেলো, একবার পেছন দিকে তাকালো না। সঙ্গে গেলো কে ?

শ্রোতাগণ। (উত্তেজিত ভাবে সমস্বরে) কে কে ? বলো বলো, তার নাম বলো !

আবদুস সাত্তার। (উঠে দাঁড়িয়ে, গম্ভীরভাবে) আমি বলবো, কে সে ! সে আর কেউ নয়, শয়তান। সৎমানুষের চিরন্তন শত্রু, শয়তান।

(মঞ্চে কয়েক মুহূর্তের জন্য আকস্মিক প্রগাঢ় নীরবতা। আলোর তলে শুধু মতলুব আলীর অতিশয় বিহ্বল চেহারা দেখা যাবে।)

মতলুব আলী। (না বুঝে, আস্তে) শয়তান?

একজন শ্রোতা। কে?

আবদুস সাত্তার। শয়তান! মানুষের কুমন্ত্রণাদাতা শয়তান!

(আবার কয়েক মুহূর্তের জন্য নীরবতা। একজন শ্রোতা কাশে। আরেকজন শ্রোতা হঠাৎ ঈষৎ হেসে ওঠে। আবার নীরবতা। তারপর অসচ্ছন্দভাবে, কিছুটা বোকার মত শ্রোতাগণ হাসতে শুরু করে। প্রথমে দু-একজন, তারপর সকলে। প্রথমে আস্তে, তারপর সজোরে। সে-হাসিতে পুলিশ-চাপরাশীও যোগদান করে।)

জজ। (হাতুড়ি পেটান। মঞ্চে আলো জ্বলে ওঠে) আদালতে এত গোলমাল কেন, কিসের এত হাসি? (আবার হাতুড়ি পিটিয়ে) সবাই চুপ হোন। চুপ হোন। না হলে পুলিশ দিয়ে এজলাস খালি করিয়ে দেব!

উকিল। কি বলবো হুজুর, আপনার পুলিশও হাসছে! সব বেত্তমিজ লোক!

জজ। (দুঃখের সঙ্গে আপন মনে) সবাই হাসে। হাসো, হাসো। খালি আমারই হাসি আসে না। কিন্তু কর্তব্য পালন ক'রে যেতেই হবে। কর্তব্য না ভূতের বোঝা। তাছাড়া কর্তব্য-পালনে কোন ভুলচুক যাতে না হয় তার জন্যে তারাও প্রতিক্ষণ কোলা ব্যাঙের মত চোখ মেলে বসে থাকে। (কেরানীর দিকে চেয়ে শ্রান্তকন্ঠে) কি সাবুদ ডেকেছ? এ-মকদ্দমা কি শেষ হবে না কখনো?

কেরানী। (উঠে) হুজুর, মকদ্দমায় এক নোতুন ফ্যাকড়া উঠেছে।

জজ। (হুঙ্কার দিয়ে) কী নোতুন ফ্যাকড়া?

কেরানী। (সভয়ে অনিশ্চিত কন্ঠে) শুনানীতে নোতুন কথা জানা গিয়েছে।

জজ। কী নোতুন কথা ?

কেরানী। (আরো ভয় পেয়ে) আসামী একা ছিলো না। তার সঙ্গে কেউ ছিলো। সেই তাকে তার দুষ্কর্মে কুমন্ত্রণা দিয়েছিলো।

জজ। (বজ্রকন্ঠে) কে সে, কী তার নাম ?

কেরানী। (তার ঠোঁট নড়ে, কিন্তু আওয়াজ বের হয় না।)

জজ। কেরানী তোতলাতে শুরু করেছে। নিশ্চয়ই সাহায্যকারী লাট-বেলাটের মত উচ্চপদস্থ সুনামধারী কেউ হবে। (ধমকে) ভয় করো না। এটা আদালত। এখানে পদমর্যাদা উপেক্ষা ক'রে ন্যায়-অন্যায় সত্য-মিথ্যার বিচার হয়। নির্ভয়ে বলো তার নাম।

কেরানী। (মাথা নত করে ক্ষীণ কন্ঠে) সরকারী কাগজ-পত্রে মশগুল ছিলাম, নামটা ঠিক ধরতে পারিনি।

জজ। (ভর্ৎসনা করে) সরকারী কাগজে কেবল হাল চালাতে জানো, কাজের ব্যাপারে ঢেঁড়স্। (কেরানী ব্যস্তত্রস্ত হ'য়ে কাগজ নাড়ে চাড়ে। জজ শ্রোতাদের দিকে তাকায়) কে সে ? কী তার নাম-ঠিকানা, কী তার পেশা ?

মতলুব আলী। বলেছিলাম, আপনার বিচার-কার্যে সাহায্য করবো। হুজুর, আমিই তার কথা তুলেছি।

জজ। তবে বলেন তার নাম। জলদি জলদি।

মতলুব আলী। তার নাম ? তার নাম জানি না হুজুর। তাকে চিনি, কিন্তু কসম খেয়ে বলছি তার নাম জানি না।

জজ। নাম না জানুন, তার পেশা বলুন, তার চেহারার বিবরণ দিন।

মতলুব আলী। পেশা আবার কী ? না, তার পেশা কি জানি না, চেহারার বিবরণও দিতে পারবো না। কিন্তু একটা কথা জানি। সে যখন কারো ভেতরে প্রবেশ করে তখন তা বুঝাতে বিন্দুমাত্র দেরী হয় না। তখন হঠাৎ আকাশের

নীলিমা রং বদলায়, সবুজ-গাছপালা বর্ণহীন হয় আর সারা দুনিয়া ধূ ধূ প্রান্তরে পরিণত হয়। যার ভেতরে সে প্রবেশ করে, সে আর মানুষ থাকে না।

আবদুস সাত্তার। আহাম্মক কোথাকার! আমি বলেছি তার নাম। তার নাম শয়তান। সে-নাম কখনো শোনেননি?

জজ। (মতলুব আলীকে) আমাদের সলিম বহুরূপীর কথা বলছেন না তো?

মতলুব আলী। (জজ বা আবদুস সাত্তারের কথা না শুনে আপন মনে) তার নাম জানি না। তার চেহারা বীভৎস, শুধু এইটুক জানি। কিন্তু আসলে তার কোন চেহারা নেই আপনার আমার মত। সে আপনাতে আমাতেই রূপান্তরিত হয়। আমি জানি সে আমার মধ্যে স্থান নিয়েছে। আমি সে, সে-ই আমি। যে কোন মানুষে সে রূপান্তরিত হ'তে পারে। এমন কি সাদা ধবধবে লেবাস পরা মৌলবী মানুষের আকারও সে ধারণ করতে পারে।

জজ। (সন্দিগ্ধ ভাবে আবদুস সাত্তারকে দেখিয়ে) ওঁর মত?

শ্রোতাগণ। (আবদুস সাত্তারের দিকে তাকায়।)

মতলুব আলী। (লক্ষ্য না ক'রে) কিন্তু জজসাহেব. আমি তাকে ভালো ক'রে জানি। একবার সে এলে জীবনের কাঠি মট ক'রে ভেঙে যায়, আর জোড়া লাগে না। জীবনে তখন থাকে হিংস্রতা আর কলুষতা, হিংসা আর বিদ্বেষ।

জজ। (তাকে থামিয়ে) আপনি থামুন! (আবদুস সাত্তারের দিকে চেয়ে কঠিন কন্ঠে) আপনি কে?

আবদুস সাত্তার। (প্রথমে এধার-ওধার তাকিয়ে) আমাকে বলছেন?

জজ। আপনাকেই বলছি। আপনি কে?

মতলুব আলী। (আত্মবিস্মৃত অবস্থায়ই হঠাৎ জজের নিকট আবেদন করে) হুজুর, আমাকে বাঁচান! আর সহ্য হয় না। (বুক চেপে) ভেতরটার অবস্থা যদি জানতেন! জজসাহেব!

জজ। (আবদুস সাত্তারকে) বলুন আপনি কে?

আবদুস সাত্তার। (বিস্ময়ে) কেন, আমি মৌলবী আবদুস সাত্তার নেওলাপুরী। নেওলাপুরের প্রসিদ্ধ মৌলবী। কে না চেনে আমাকে?

জজ। এ আদালতে আপনার কি কাজ?

উকিল। (লাফিয়ে উঠে) হুজুর, আপনি নিশ্চয় ঠাট্টা করছেন।

জজ। (গুরু গম্ভীর কন্ঠে) বিচারক কখনো ঠাট্টা করে না। (আবদুস সাত্তারকে) উত্তর দিন আমার প্রশ্নের।

উকিল। এ কী কাণ্ড জজসাহেব। মৌলবী আবদুস সাত্তার এ-মকদ্দমার ফরিয়াদী। আমেনার মকদ্দমা। তিনিই আসামীকে ধরেছিলেন হাতে-নাতে। আপনি সব জানেন, জজসাহেব।

মতলুব আলী। (নোতুন সন্দেহ এলে, আপন মনে) আমার কোন ভুল হয়েছে কি?

জজ। (উকিলকে) চালাকি করবেন না। আপনার মৌলবী নেওয়ালপুরের বাইরে সে-জঙ্গলে কি করছিলেন?

উকিল। কেন সে-কথা জিজ্ঞাসা করছেন? আপনি সবই জানেন জজসাহেব। সব কথা বলা হয়েছে আদালতে।

জজ। কথার স্রোত বয়েছে, কিন্তু আসল কথাটা কেউ বলেনি। (আবদুস সাত্তারের দিকে তাকিয়ে) বলুন আপনার সত্য বিবরণ। বাইরের চেহারা আর পোশাকের বিবরণ নয়, ভেতরের সত্যিকার বিবরণ।

আবদুস সাত্তার। (হঠাৎ হেসে উঠে চারধারে তাকায় সমর্থনের জন্য, কিন্তু শ্রোতাগণ নীরব থাকে। তাদের চোখে সন্দেহের ছায়া।)

জজ। বলুন, আসামীর কানে-কানে কী বলেছিলেন? ভেবেছিলেন জজ ঘুমিয়ে ছিলো। না, জজ কখনো ঘুমায় না। তার চোখে ঘুম নেই।

উকিল। বড় বাড়াবাড়ি হচ্ছে জজসাহেব। মৌলবী আবদুস সাত্তার গণ্যমান্য শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। আশ-পাশে তাঁর যথেষ্ট সুনাম।

জজ। আমার কথায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করবেন না। আপনি পীর-পয়গম্বর নন, নবীও নন, কী করে জানেন আপনার মক্কেলের আসল পরিচয়?

আবদুস সাত্তার। একি কথা! সকলেই জানে আমি কে। আপনিও জানেন।

জজ। আমি বিচারক। সত্যকার বিচারক চেহারা-পোশাকে বা মুখের কথায় প্রভাবিত হয় না। সদা সর্বদা সে সেই দোষীর সন্ধানে থাকে যাকে আইনের মারপ্যাঁচে ধরা সোজা কথা নয়। না, সহজে সে জালে ধরা পড়ে না, হাতের মুঠোতে আটকালেও ফস্কে যায় আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে। কিন্তু সে-ই হচ্ছে আসল দোষী, সব দুষ্কৃতির কর্মকর্তা। তবে বড় দুঃখের কথা এই যে, তার হাতে বিচারককে হার মানতে হয় বারবার। বিচারকের সামনে দিয়ে দিনের পর দিন আসামীর মিছিল চলে যায়, কিন্তু আসল দোষীকে ত্রিসীমানায়ও দেখা যায় না। এ-জন্যেই বিচারকের ঘুম হয় না, বুকে ভার হ'য়ে থাকে গোপন দুঃখ বেদনা। (আমেনার দিকে তাকিয়ে) আসামী, বল তোমার বক্তব্য। তোমার অপরাধ আমি জানি। সে অপরাধ অত্যন্ত গুরুতর। আইনে তার শাস্তিও ভয়ানক। কিন্তু সুস্থ মস্তিষ্কে এমন নিষ্ঠুর কাজ কোন মা করতে পারে না। বল, কে তোমাকে কানে-কানে কুমন্ত্রণা দিয়েছিলো, কে তোমাকে উস্কিয়েছিলো?

আমেনা। (নীরব।)

যুবক। (নিম্ন কিন্তু উত্তেজনাভরা গলায়) তাকাও আমেনা, তাকাও তোমার শত্রুর দিকে।

শ্রোতাগণ। (ঈষৎ ইতস্তত করে) বলো, আমেনা, বলো তোমার বক্তব্য।

জজ। (সংযত কন্ঠে, আমেনাকে) ভয় পেয়ো না। ভয়ের কিছু নেই। পোষাক-পরিচ্ছদ চেহারা অবয়ব আসল সত্য নয়। (আবদুস সাত্তারকে দেখিয়ে) তাকাও তাঁর দিকে। তাঁকে চেন তুমি? তাঁকে দেখেছ কখনো?

শ্রোতাগণ। (উচ্চকন্ঠে) তাকাও আমেনা, মুখ তুলে তাকাও। তাকাও, তাকাও!

ভিখারিণী। (হেসে) ব্যর্থ চেষ্টা। মানুষ তখনই নিজের সন্তানের প্রাণ নেয় যখন এ-দুনিয়ায় তার আর কোন নালিশ-অভিযোগ নেই, বিচারেরও আশা নেই। এ-মেয়েলোক তার শেষ কান্না কেঁদেছে, শেষ কথাও বলেছে। কোলে মৃত সন্তান, শেষবারের মত একবার কেঁদে বিজলী ঝল্‌সানো মানুষের মত সে বসে আছে। হঠাৎ মুখ তুলে দেখে, মৌলবী আবদুস সাত্তার দাঁড়িয়ে।

জজ। কে দাঁড়িয়ে?

ভিখারিণী। স্বনামধন্য নেকদিল পরেজগার মানুষ মৌলবী আবদুস সাত্তার নেওলাপুরী।

উকিল। জজসাহেব, ফরিয়াদী নেওলাপুরী।

জজ। (ধৈর্যহারা হয়ে) আবার নেওলাপুরী।

ভিখারিণী। তার গায়ে সাদা আলখাল্লা, মুখে নূরানির ভাব। আমেনা ভাবলো, ফেরেশ্‌তা এসেছে তার মৃত শিশুকে বেহেশ্‌তে নিয়ে যাবার জন্যে। সে বললো, আমার বাচ্চাকে গলা টিপে মেরে ফেলেছি। অনেক কষ্ট হয়েছিলো, কিন্তু বাচ্চা আমার বেহেশ্‌তে যাবে, তাই আর কোন দুঃখ নেই। সাদা আলখাল্লা-পরা লোকটি যাকে সে ভেবেছিলো ফেরেশ্‌তা, সে দাঁত-মুখ খিচিয়ে বললো, বেহেশ্‌তে? তোমার বাচ্চা যাবে আসল দোজখে। কারণ মায়ের গুনাহ্‌র ছোঁয়া লেগেছে তার রক্তে। শুনে ভয়ে আমেনার সারা শরীর শীতল হয়ে গেলো। তারপর তার মুখ থেকে একটা আওয়াজও বের হয় নি। সে

হাসেও নি। নেওলাপুরী যে-হাসি শুনে দ্বিগুণ বেগে দৌড়তে শুরু করেছিলো সে-হাসি জেগেছিলো তার নিজের অন্তরেই। নির্মম সত্যের মুখোমুখী হলে এরা হাসে না। না, সেই থেকে একটি শব্দ উচ্চারণ করে নি সে, কারো প্রতি তার আর নালিশও নেই। কিসের নালিশ, কিসেরই এই আদালত?

শ্রোতাগণ। (কয়েক মুহূর্ত পরে, ভগ্নকন্ঠে) আমেনা! আমেনা!

মতলুব আলী। (চোখ উদভ্রান্ত; উত্তেজিত ভাবে) আমি যেন দেখতে পাচ্ছি, সব দেখতে পাচ্ছি। উঠানে বসে আছে আমেনা, বাঁশের ডগায় বসে কাক ডাকছে, ছেলে-মেয়েগুলো পা ছড়িয়ে বসে ট্যাঁ-ট্যা করছে। হঠাৎ বেড়ার ফাঁক দিয়ে একটি লোক এগিয়ে এলো, এত আলগোছে যেন হাওয়ায় পা ফেলে এলো। গায়ে ধবধবে সাদা আলখাল্লা। এধার-ওধার চেয়ে আমেনার কাছে সে ব'সে পড়লো পায়ের গোড়ালীতে ভর দিয়ে। তারপর সে কানে-কানে বললো, আমেনা, এসো আমেনা, আমি যা বলি তাই করো। শুনছ? এসো, অন্তত একটা সমস্যার সমাধান করি। পরপর সব দৃশ্য ভেসে উঠছে চোখের সামনে। ঐ পুকুরের ধার দিয়ে, করিমউদ্দিনের ক্ষেতের পাশ দিয়ে দ্রুতপদে চলছে আমেনা, বুকে তার অবোধ শিশু। তারপর সেই জঙ্গলের নিদারুণ দৃশ্য। সব সময়েই পায়ে পায়ে আছে সে-লোকটি, পরনে তার সাদা আলখাল্লা।

উকিল। (চেঁচিয়ে) জজসাহেব! জজসাহেব! এসব কী হচ্ছে! জজসাহেব! আমরা সুবিচার চাই।

জজ। (হাতুড়ি পিটিয়ে) খামোশ! সবাই চুপ করুন! (মতলুব আলীকে) তারপর?

আবদুস সাত্তার। কী করে চুপ করি জজসাহেব? এ-সব কী বে-বিচার আর বিভ্রান্তমস্তিষ্কের হেলা-খেলা? মাত্রাতিরিক্ত হলে সহ্য হবে না। ধৈর্যের সীমা আছে বলছি।

মতলুব আলী। (আনন্দে আত্মহারা হয়ে) জজসাহেব, সবই দেখতে পাচ্ছি! চোখের সামনে থেকে কালো পর্দাটি যেন সরে গেছে। সর্বত্র হু হু করে হাওয়াও যেন ছুটেছে। কী তেজ তার, কিন্তু আবার কি তৃপ্তি তাতে।

উকিল ও
আবদুস সাত্তার। (একযোগে) জজসাহেব!

জজ। (কয়েকবার হাতুড়ি পিটিয়ে গুরুগম্ভীর কন্ঠে উকিলকে) নিশ্চিন্ত হোন, শ্রদ্ধেয় নেওলাপুরী মৌলবীর বিরুদ্ধে আমার বলার কিছু নেই।

উকিল ও
আবদুস সাত্তার। (অবিশ্বাসের চোখে জজের দিকে তাকায়। তারপর ক্রমশ তাদের মুখভাবে পরিবর্তন দেখা দেয়। অবশেষে তাতে স্বস্তির ভাব দৃষ্টিগোচর হবে। শ্রোতাগণ ব্যাপারটি বুঝতে পারে না।)

আবদুস সাত্তার। (হেসে) জজসাহেব ঠাট্টা করছিলেন!

উকিল। (হঠাৎ হি হি করে হেসে ওঠে।)

জজ। (একবার হাতুড়ি পিটিয়ে মঞ্চ নীরব হলে গুরুগম্ভীর কন্ঠে) ভুল ধারণা। বলেছি আপনাদের, জজ কখনো ঠাট্টা করে না।

উকিল। কেন নয়? জজও আর দশ জনের মত মানুষ।

জজ। না। জজ ঠাট্টা করে না। করে না, কারণ সে সব কিছু দেখতে পায় না। যে-মানুষ সব কিছু দেখতে পায় সে-ই ঠাট্টা করতে পারে। তবে সুবিচারের গোড়ার কথা সন্দেহ। যা সে দেখতে পায় তা সে বিশ্বাস করে না। সে কেবল জানে এই কথা যে, সব কিছু সে দেখতে পারছে না।

উকিল। (চোখে আবার কেমন সন্দেহের ভাব এলে) কী দেখতে পান না, জজসাহেব?

জজ। ধরুন আমাদের সামনে দণ্ডায়মান মৌলবী আবদুস সাত্তার নেওলাপুরী। তাঁর চেহারায় বেশভূষায় কোন ভুল নেই।

যারা তাঁকে চেনে তারা একদৃষ্টির পরেই তাঁকে নিঃসন্দেহে সনাক্ত করতে পারবে।

উকিল। তাতে কোন সন্দেহ নেই জজসাহেব।

জজ। কিন্তু সবটাই বাইরের আবরণ, সবটাই বাহ্যিক রূপ। বেশভূষা-চেহারায় কোন ভুল নেই, তবু কে তিনি? কে মৌলবী নেওলাপুরীর চেহারা গ্রহণ করে তাঁর বেশভূষায় আচ্ছাদিত হয়ে এখানে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন?

আবদুস সাত্তার। (নতুন বিস্ময়) এটা আবার কী রকম কথা! (চতুর্দিকে তাকায়, কিন্তু উকিল ছাড়া সবাই নিথর হয়ে থাকে, সকলেরই মুখে সন্দেহের ছায়া)

জজ। মৌলবী নেওলাপুরীর চেহারা ধারণ করে এবং তাঁর বেশভূষা পরে যে লোকটি এ-আদালতে দাঁড়িয়ে, তাঁর বিরুদ্ধে একটি দুষ্কর্মে সহায়তার গুরুতর অভিযোগ তোলা হয়েছে। সে-অভিযোগটি যথাযথভাবে পরীক্ষা করে দেখা একান্ত প্রয়োজনীয়। অভিযোগটি পরীক্ষাধীন থাকাকালে তাঁকে হাজতে রাখা হবে। অভিযোগটি মিথ্যা প্রমাণিত হ'লে সে অবিলম্বে মুক্তি পাবে, কিন্তু আবার সত্য ব'লে প্রমাণিত হ'লে তার উপযুক্ত শাস্তি হবে। (উঠে দাঁড়ান।)

উকিল। (চীৎকার ক'রে) জজসাহেব! জজসাহেব!

(উকিল ছুটে যায় জজের দিকে। জজকে আদালত পরিত্যাগ করতে দেখা যাবে। আবদুস সাত্তার অতি বিস্ময়ে জজের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। একটি পুলিশ এগিয়ে এসে তার পাশে দাঁড়াবে। শ্রোতাগণ দাঁড়িয়ে হঠাৎ উৎফুল্লস্বরে ডাকবেঃ আমেনা! আমেনা! মঞ্চে হৈ হুলুস্থূল হবে। তারপর পর্দা নাববে।)

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

(মঞ্চের ডান ভাগে পাদপ্রদীপের সন্নিকটে তিনজন গ্রামবাসী পাছায় ভর দিয়ে নিশ্চল-নির্বাকভাবে বসে। তাদের দৃষ্টি অবনত, মুখ ভাবশূন্য। তবু মনে হয় তারা অপেক্ষা করছে। তাদের গা-এ তিনরঙের চাদর ঃ লাল, সবুজ এবং হলুদ। তাদের উপর চক্রাকার উজ্জ্বল আলো। বাকী মঞ্চ অন্ধকারাচ্ছন্ন।

মঞ্চের মধ্যভাগে আবছায়ার মধ্যে ভিখারিণীকে দেখা যাবে। সে গ্রামবাসীদের দিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে। মঞ্চে উপস্থিত অন্যান্য চরিত্র প্রায় অন্ধকারের মধ্যে মিশে থাকবে। ডান দিকে জেলের লোহার খাটে আবদুসসাত্তার শুয়ে। তবে ঘুমিয়ে যে নয় তা বোঝা যাবে। তার খাটের পাশে একটি শিকের দরজা। পেছনে পার্টিশন জাতীয় কিছুতে জেলের একখণ্ড দেয়াল। বিপরীত দিকে সেকেলে আমলের বৃহৎ একটি খাটে জজ শায়িত। তাঁর খাটের পেছনে পূর্ববৎ পার্টিশন জাতীয় কিছুতে শোবার ঘরের নমুনা।

মঞ্চের একেবারে পেছনে আমেনা এবং তার পাশে একটি পুলিস দাঁড়িয়ে। একটু দূরে যুবকও দাঁড়িয়ে। যতটা সম্ভব, এ তিন চরিত্র দর্শকের কাছে অদৃশ্য হয়ে থাকবে।

পর্দা ওঠার পর কয়েক মুহূর্ত সমগ্র মঞ্চে গভীর নীরবতা বিরাজ করবে। কেবল দূরে একটি কুকুর ছানার অবিশ্রান্ত আর্তনাদ শোনা যাবে। অভিনয় শুরু হলে কখনো কখনো সে আর্তনাদ জোরালো হবে। তারপর থেমে যাবে।)

ভিখারিণী। (গ্রামবাসীদের প্রতি) কি গো, বাড়ী কোথায় তোমাদের ?

গ্রামবাসীরা। (নির্বাক। যেন শোনে না)

ভিখারিণী। (একটু অপেক্ষা করে) মামলা-মকদ্দমার কাজে এসেছো বুঝি ? (উত্তর না পেয়ে) কিহে, কথা বলতে ভয় কি ? বলো কিছু ! ক্ষেতখামারের কথা বলো, ধান-ফসল গরু-ছাগলের কথা বলো। (আবার একটু অপেক্ষা করে) অমন বোবার মত বসে আছ কেন ? শুনি একটু মুখের কথা। কুশল-সমাচার না থাকলে দুঃখের গীত গাও, তবু বলো কিছু ! (এবারও কোন উত্তর আসে না। শুধু একজন গ্রামবাসী একটু নড়ে-চড়ে আবার নিশ্চল হয়।)

আবদুস সাত্তার। (হঠাৎ অন্ধকার থেকে হুঙ্কার দিয়ে) না, জ্বালাতন করে মারলো ! কার সাধ্য একটু চোখ বোজে। (কুকুর ছানার আওয়াজ কয়েক মুহূর্তের জন্য জোরালো হবে) মশাও বেইনতেহার ! (মশা মারার আওয়াজ শোনা যাবে)

ভিখারিণী। (মঞ্চ নীরব হলে আবার গ্রামবাসীদের লক্ষ্য করে) কিহে ? কিছুই বলবে না ? এত নদীঘাট পেরিয়ে এলে, তবু হুঁ-হাঁটি পর্যন্ত করবে না ? (আবার একটু অপেক্ষা করে এবার বিরক্তিসূচক আওয়াজ করে) বেশ, বেশ ! থাকো বসে বাত্যাহত কদলীর মত, বলো না কিছু। পেটে কথা থাকলে পেট ফুলে ঢোল হয় যেন। (ভর্ৎসনায়ও কোন ফল হলো না দেখে মুখ ঝাম্টা দিয়ে ভিখারিণী মুখ সরিয়ে নেবে।)

(গ্রামবাসীদের উপর আলো নিভে যাবে। এবার উজ্জ্বল আলো পড়বে ভিখারিণীর উপর। না উঠে সে দর্শকের দিকে সামান্য এগিয়ে আসবে।)

ভিখারিণী। (ইশারায় গ্রামবাসীদের দেখিয়ে গোপন কথা প্রকাশ করার ভঙ্গীতে দর্শকের দিকে তাকিয়ে) তারা অপেক্ষা করছে। আজে-বাজে কথায় কান নেই, মতলবের খেয়ালেই আছে। মতলব আর কিছু নয়, বুকে বসে দাড়ি উপড়ানো। সময়

এলে বিদ্যুৎবেগে লাফিয়ে পড়বে বুকের উপর। কি বলি, যুদ্ধের বড় তোড়জোর লেগেছে। সাজসরঞ্জাম শেষ হলে, গোলাবারুদ-অস্ত্রশস্ত্র মওজুত হলে, হৈ-হৈ করে যুদ্ধ শুরু হবে। এখন তারা বসে আছে নিরীহ বোবা মানুষের মত। যখন ডাক পড়বে তখন নিরীহ বোবা মানুষটি আর থাকবে না। (হঠাৎ এধার-ওধার চেয়ে) শুনছো? (একটু অপেক্ষা করে) কোথায় গেলে আমার যুবকবন্ধু, আমার আঁধারের মাণিক? লড়াইর আভাস পেয়ে উর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে গেলে না তো?

আবদুস সাত্তার। (আবার হুঙ্কার দিয়ে) কী জ্বালাতন! কেউ ওটাকে থামায় না কেন? (কুকুর ছানার আওয়াজ জোরালো হবে) না, হদ্দ হয়ে গেলাম। কে আছ? (একটু অপেক্ষা করে) না, কেউ কোথাও নেই।

ভিখারিণী। আছে আছে, সবাই আছে। তাদের জন্যে অন্ধকার কিলবিল করছে না? এমন কি আমার যুবকবন্ধুও আছে। প্রাণে ভয়, কিন্তু অদম্য কৌতূহল। তবে নেহাৎ বেহুদা কৌতূহল। সুখে ছিলো, সুখে থাকতো। কিন্তু সুখে থাকলে আবার ভূতে কিলায়। সে বুঝবে এবার কত ধানে কত চাল। ঢাল-তলোয়ার নেই, আমীর হবার সখ। (আবার এধার-ওধার তাকিয়ে) কি হে, তুমিও বোবা হলে নাকি? (একটু অপেক্ষা করে) বেশ, বেশ। কথা বলো না। কেউ কথা বলো না। (বিরক্তি সহকারে মুখ ফেরায়)

(ভিখারিণী নীরব হলে কয়েক মুহূর্ত পরে মঞ্চের পশ্চাতে পুলিশটি কেশে উঠে।)

আবদুস সাত্তার। কে? কে কাশে?

ভিখারিণী। (আপন মনে) তবু কার বুকে ভয় নেই? জান থাকলেই ভয় আসে, তা ঢাকা যায় না। শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না। তাছাড়া লক্ষ কোটি মানুষ থাকুক, তবু একটি মানুষ একটি মানুষই। লক্ষ কোটি তারা থাকুক, তবু

একটি তারা একটি মাত্র তারা। (আবার এধার-ওধার তাকিয়ে) কোথায় গেলে আমার সত্যসন্ধানী যুবকবন্ধু? একবার এসো না কাছে?

আবদুস সাত্তার। (হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বসে) না, কুকুর ছানাটি সত্যি বড় জ্বালাতন করে খেলো। একটু চোখ বুঝতে পারলাম না! কেউ গলা টিপে তার মুখ বন্ধ করে না কেন?

ভিখারিণী। (বিরক্তি ভরে) যাক চুলায়। আমার কী?

আবদুস সাত্তার। শিকের দরজার কাছে এগিয়ে এসে লোহায় আওয়াজ করে। (ক্রমশ সে আওয়াজ বাড়বে) কে আছ? কে আছ?

ভিখারিণী। আমার মাথা-ব্যথার কারণ কি? আমি সাতে-পাঁচে নাই, কোন দায়িত্বে আমার হাত নাই। তাদেরই গড়া সমাজ। তাতে দোষ-ঘাট থাকে তো তা তাদেরই সৃষ্টি। কেবল দোষ-ঘাটের জরিমানা না দিয়ে পারে না আর সে জরিমানা কিছুটা আমার পাতে পড়ে। ফাঁকির জীবন আমার, কিন্তু আবার বেঝঞ্ঝাটে আয়েসী জীবনও। জবাব না দেও, না দেও। আমার ক্ষতি নাই।

আবদুস সাত্তার। (পূর্ববৎ দরজায় আওয়াজ করে) কে আছ? কে আছ? (এবার তার উপর আলো পড়বে দেখা যাবে, তার পরনে কয়েদীর পোশাক। উজ্জ্বল আলোতে তার চোখে প্রথমে ধাঁধা লাগবে, তারপর আলোতে চোখ অভ্যস্ত হলে সে এধার-ওধার তাকিয়ে কারো সন্ধান করবে।)

ভিখারিণী। (ঠাট্টার সুরে) আহা, অবশেষে অন্ধকার কাটতে শুরু করেছে। তবে বলে দিলাম, এ আলো হাসি-আনন্দের আলো নয়। হুঁশিয়ার হও সবাই, হুশিয়ার হও। (তারপর সে লক্ষ্য করে যে আবদুস সাত্তার ভ্রূকুটি করে, জজের খাটের দিকে তাকিয়ে আছে) কী দেখছেন?

আবদুস সাত্তার। (তারপর প্রশ্নে কান না দিয়ে, আস্তে) জজসাহেব।

ভিখারিণী। কোথায় জজসাহেব? কেউ কোথাও নেই।

আবদুস সাত্তার। (এবার গলা চড়িয়ে) জজসাহেব!

ভিখারিণী। (উষ্ণভাবে) বললাম না, কেউ কোথাও নেই! সব চোখের ভুল। (পেছনের দিকে তাকিয়ে) কী হে যুবকবন্ধু, দেখতে পাও কিছু?

আবদুস সাত্তার। জজসাহেব, কুকুর ছানার চীৎকারে ঘুমটা হলো না। সাধ্য কী একটু চোখ বুঝি। শুনছেন?

ভিখারিণী। দোষ এবার কুকুর ছানার! ঘুম না আসে তো কানে তুলো দিলেই হয়।

আবদুস সাত্তার। শুনছেন জজসাহেব?

ভিখারিণী। কেন এমন ফেউ ধরেছেন জজসাহেবের পেছনে? একটু অবসর দেবেন না তাঁকে?

আবদুস সাত্তার। (অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভিখারিণীর কথা শোনে। তারপর) না, কোন নালিশ যদি থাকে তা আমারই আছে। আমার উপর জজের আস্থা নাই। নালিশ তাই। (দরজা ঝেঁকে) তবে গরাদের এপাশে যার স্থান তার নালিশ থাকতে পারে, কিন্তু শক্তি নেই।

ভিখারিণী। শক্তি নেই? ফু দিলেই দরজাটা ধ্বসে পড়বে। কাকে ফাঁকি দিচ্ছেন?

আবদুস সাত্তার। (হঠাৎ সচেতন হয়ে, ধম্‌কে) তুমি চুপ করো! (জজকে) জজসাহেব!

ভিখারিণী। যাকে ভাঙতে চান তাঁরই সঙ্গে কথা বলতে দ্বিধা হয় না একটু? তিনি সব জানেন।

আবদুস সাত্তার। (বিরক্তির সঙ্গে) কী জানেন?

ভিখারিণী। তিনি জানেন কেন আপনি তাঁকে ভাঙতে চান। যাতে আপনি যা বললেন তাই তিনি করেন।

আবদুস সাত্তার। (সজোরে মাথা নেড়ে আপন মনে) না না। গোড়ায় গলদ। উদ্দেশ্য গোড়ায় গলদ। আমাদের মতভেদের কারণ তাই।

ভিখারিণী। ভুষা কালি কথায় সাদা হয় না।

আবদুস সাত্তার। সাদা দিলে তাকালেই সাদা হয়। আমার দাবীতে অন্যায় কোথায়? জজ হলে জজীয়তি করতেই হয়।

ভিখারিণী। একে ফাঁসি দাও, ওকে কয়েদ কর, এর সংসারে আগুন জ্বালিয়ে দাও, ওর জমি নিলামে তোল। শাস্তি দিয়ে যাও, কেবল শাস্তি। কাউকে খালাস দিও না। ন্যায্য দাবী বৈ কি! আপনি ভাবেন আইন-কানুন জজের চোখের ঠুলি। সে ঠুলির জন্যে তিনি কিছু দেখতে পান না। ভুল! আজ সে-ঠুলিতে অনেক ছিদ্র।

আবদুস সাত্তার। চোখের ঠুলি হতে যাবে কেন? আইন-কানুন অন্যায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র, নিঃসহায়ের একমাত্র সম্বল।

ভিখারিণী। শুধু ঠুলি পরিয়েই ক্ষান্ত হন নি। আইন-কানুনের তৈরী শক্ত কেল্লায় তাঁকে আপনি বন্দী করেছেন।

আবদুস সাত্তার। (বিস্ময়ে) কেল্লাই যদি হয়, তবে সে-কেল্লায় তিনি যে একান্ত নিরাপদ, সে-কথা বোঝেন না কেন?

ভিখারিণী। বন্দী মানুষ মজবুত কেল্লায় নিরাপদ বোধ করে না।

আবদুস সাত্তার। (বিদ্রূপ করে) কেল্লায় বন্দী। সে-কেল্লা থেকে পালাবার সব সুড়ঙ্গ জজের জানা আছে।

ভিখারিণী। তবু কি পালাতে পারেন? সুড়ঙ্গ-পথ কি আবার শত উপ-ধারার জালে বন্ধ করে রাখেন নি? (হঠাৎ মিনতির কন্ঠে) তাকে রেহাই দিন। যতটা পারেন তিনি করেন, করেন না কি? তা'ছাড়া আপনার কেল্লার শক্ত দেয়াল তাকে তিলতিল করে পিষে ফেলছে। তিনি হাড়-মাংসের দুর্বল মানুষ মাত্র। আপনার দিলে একটু দয়ামায়া নেই?

আবদুস সাত্তার। (দৃঢ় কন্ঠে) না। জজ হলে জজীয়তি করতেই হয়। এ

কর্তব্য থেকে রেহাই পেতে চাইলে জজের লেবাস পরিত্যাগ করেন না কেন?

ভিখারিণী। না, তা এখন সম্ভব নয়। যেদিন আসামীর দীর্ঘ মিছিলে বিশ্বাস করতেন সেদিন সে-লেবাসটা বললে ছাড়তে পারতেন। কিন্তু তাঁকে জজের সং-এ সাজিয়ে তলে তলে হাসার দিন আপনার নেই। বলেছি না, আজ তাঁর চোখের ঠুলিতে অনেক ছিদ্র। আজ তাঁর কেল্লার ভেতরেও আলো ঢুকেছে। আজ তিনি সজ্ঞানেই সে সং-এর খেলা খেলতে চান। আজ আসামীর মিছিলের উপর দিয়ে তাঁর দৃষ্টি বয়ে যায়, কিন্তু নকল আসামীতে তিনি ভোলেন না। তাঁর এ দৃষ্টি অন্যত্র।

আবদুস সাত্তার। (ক্রুদ্ধভাবে) কোথায় তাঁর দৃষ্টি?

ভিখারিণী। সত্যিকার আসামীর দিকে। তারই অপেক্ষায় আছেন তিনি। অশেষ ধৈর্যের সঙ্গে দিনের পর দিন তারই জন্য অপেক্ষা করছেন তিনি। নকল জিনিস দিয়ে তাঁকে আর ভোলাতে পারবেন না।

আবদুস সাত্তার। (আপন মনে) তাই বলছিলাম, আমার উপর জজ সাহেবের বিন্দুমাত্র আস্থা নেই। কে? কেন? অন্যায়-অপচারের শাস্তি চাওয়া কী দোষের কথা? (উত্তরের জন্য একবার ভিখারিণীর দিকে তাকায়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়।)

ভিখারিণী। না, অন্যায়-অপচারের শাস্তি চাওয়াতে দোষ নেই। কিন্তু শাস্তির জন্যে কেন এত ব্যাকুলতা? কারণ কী এই নয় যে, একবার ন্যায়বান বলে সুনাম হলে তখন অন্যায় করলেও কেউ সহজে ধরতে পারবে না?

আবদুস সাত্তার। (ক্ষীপ্রভাবে তার দিকে তাকিয়ে ক্রুদ্ধকন্ঠে) কী বাজে কথা বলছ? (আপন মনে) হাতি কাদায় পড়লে চামচিকাও লাথি মারতে চায়।

ভিখারিণী। হাতী কাদায় পড়ে নি, কাদায় পড়ার ভান করছে। কিন্তু কপটতায় আর কোন লাভ নেই। জজসাহেব সত্যিই সব জানেন।

আবদস সাত্তার। জজের মাথায় একটি অদ্ভুত খেয়াল জন্মেছে বলে লোকেরা অন্যায়-অবিচার সহ্য করবে কেন? তিনি পাগল হয়েছেন বলে সবাই পাগল হয়ে সবকিছু দুর্নীতির স্রোতে ভাসিয়ে দেবে কেন?

ভিখারিণী। যাই বলুন, জজ আপনাকে আর সাহায্য করবেন না। তাঁকে ধ্বংস করতে পারেন, কিন্তু তাঁর বিদ্রোহ দমাতে পারবেন না। তাঁর হাত দিয়ে আপনার উদ্দেশ্য আর হাসিল হবে না।

আবদুস সাত্তার। (আপন মনে, হঠাৎ উচ্চস্বরে হেসে উঠে) জজ বিদ্রোহ করেছে! এমন কথা কেউ কখনো শুনেছে!

ভিখারিণী। আপনার প্রিয় প্রাসাদের থাম যেন নড়বড়ে হয়ে উঠেছে, তাই-না? কিন্তু থামটি ধ্বংস করলে প্রাসাদই ভেঙ্গে পড়বে বলে সে থামকে খাড়া রাখবার জন্যে এত চেষ্টা। কিন্তু এখন সবই বৃথা চেষ্টা। থাম বিগড়ে গেছে, তাকে আর মানানো যাবে না।

আবদুস সাত্তার। (আপন মনে, পূর্ববৎ বিদ্রূপ করে হেসে উঠে) রাইয়ত নয়, বাদশাহ্ বিদ্রোহ করেছে। মহকুমা নয়, হাকিম বিদ্রোহ করেছে। আশ্চর্য ব্যাপার! (তারপর একটি কথা স্মরণ হলে হাসি থামিয়ে) রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় বৈ-কি। তবে দুঃখের কথা, মাঝখানে উলুখড়ের প্রাণ যায়। (হঠাৎ গম্ভীর হয়ে) থামে ভাঙন ধরলে উপায় কি! নতুন থাম তৈরী করতে হয়। আশা ছাড়ি কি করে?

ভিখারিণী। জজ কিন্তু আশা ছেড়েছেন।

আবদুস সাত্তার। (আপন মনে হঠাৎ উৎফুল্ল হয়ে) না, আমি আশা ছাড়বো কেন? সমস্যার একটি সুরাহা দেখতে পাচ্ছি যেন। মনে হয়, বুঝতে পারছি কি পেলে জজ সন্তুষ্ট হবেন। (হঠাৎ জজের খাটের দিকে তাকিয়ে সজোরে) জজসাহেব! জজসাহেব! (জজকে ডাকতে ডাকতে শিকের দরজার পাশ কাটিয়ে মঞ্চের মধ্যখানে এগিয়ে যাবে। জজের উপর এবার আলো পড়বে। ভিখারিণীর উপর আলো নিভে যাবে। জজ ধড়মড়িয়ে উঠে বসেন। প্রথমে যেন কিছু বুঝতে পারেন না। মঞ্চে গভীর নীরবতা। কুকুর ছানার আর্তনাদ থেমে গেছে।)

জজ। (মুখে হাত বুলিয়ে আস্তে এধার-ওধার তাকায়। মঞ্চের পশ্চাৎভাগে দৃষ্টি পড়তেই হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে পড়ে। তারপর বজ্রকন্ঠে) কে বিড়ি খায় এখানে?

আবদুস সাত্তার। (সমবেদনাভরা কন্ঠে) কুচ-কাওয়াজে দুরন্ত শরীর হলেও দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে দিতে হয়রান হয়ে পড়ে, একটু বিড়ি-তামাক না খেয়ে পারে না জজসাহেব।

জজ। (পূর্ববৎ মঞ্চের পেছনের দিকে তাকিয়ে) কে ওখানে?

আবদুস সাত্তার। দরিদ্র পুলিস। আপনার দয়ায়ই বেঁচে থাকে। তার উপর রাগ করবেন না হুজুর।

জজ। (পূর্ববৎ) ভূতের মত দাঁড়িয়ে কী করছে ওখানে?

আবদুস সাত্তার। বললাম না? পাহারা দিচ্ছে।

পুলিস। (অন্ধকার থেকে ভীতকম্পিত কন্ঠে) হুজুর পাহারা দিচ্ছি। সারাদিন ডিউটি দিয়েছি, রাতেও আবার দিচ্ছি।

জজ। (হুঙ্কার দিয়ে) পাহারা! কার পাহারা!

আবদুস সাত্তার। (হেসে) কার আবার? আমেনার। আমেনার পাহারা দিচ্ছে।

জজ। (উত্তর দেন না। হঠাৎ কী একটা কথা বুঝতে পেরে মাথা অবনত করে ভাবেন। মনে হয় হঠাৎ শ্রান্তিতে ভরে উঠেছে সারা দেহ।

আবদুস সাত্তার। (আড় চোখে একবার জজের দিকে তাকিয়ে প্রতিবাদ করে) কিন্তু এটা বড় জুলুম! দিনেও ডিউটি, রাতেও ডিউটি। শরীরে কত সয়?

জজ। (হঠাৎ মাথা নেড়ে গভীর শ্রান্তির সঙ্গে আপন মনে) না, নিঃশ্বাস নেবার গতি নেই। ক্রমাগত ঠেলছে আমাকে। দিনের পর দিন, কেবলই ঠেলছে।

আবদুস সাত্তার। কিন্তু কর্তব্য হলো কর্তব্য। তাতে ফাঁকিজুকি চলে না।

জজ। (আপন মনেই) জানি, জানি। সব বুঝি।

ভিখারিণী। (আবদুস সাত্তারকে) জজসাহেব আপনার অভিসন্ধি কি বোঝেন না? আপনি চান, তিনি এত ক্লান্ত হয়ে পড়েন যে সত্যিকার অপরাধীর সন্ধান করার শক্তি যেন তার আর না থাকে, একদিন সে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেও তাকে চিনতে যেন না পারেন।

আবদুস সাত্তার। (ব্যস্তবাগীশ হয়ে জজকে) কথাটা উঠেছে ভালই হয়েছে। পাহারায় কোন শিথিলতা হওয়া কেন উচিত নয় তা বোঝা যাবে। (জরুরী ব্যাপার ঘোষণা করার ভঙ্গীতে) জজসাহেব! আসামীর সম্পূর্ণ অপরাধ বলা হয় নি।

জজ। আরো বাকী আছে?

আবদুস সাত্তার। আরো বাকী আছে। একটু চালাকি করেছিলাম, মাফ করবেন। ইচ্ছা করেই অপরাধের সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত প্রকাশ করি নি। ভেবেছিলাম, অপরাধ অল্প হলে অপরাধীকে শাস্তি দিতে দ্বিধা করবেন না। জানতাম না, অপরাধ অতিশয় ঘৃণার্হ হলেই আপনি অপরাধীর দিকে চোখ তুলে তাকান।

জজ। (আপন মনে) আমার চোখ? আমার চোখ সব সময়ই খোলা। ঘোর অন্ধকারেও পেঁচার চোখের মত নিষ্পলক।

আবদুস সাত্তার। (কৃত্রিম উল্লাসভরে, নাটকীয় ভঙ্গীতে) জজসাহেব, বড়ই সুখবর! আপনার কঠিন সন্ধান সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। যে-ঘোর পাপীর সঙ্গে মুখোমুখি হবার জন্যে এতদিন অধীর অপেক্ষায় ছিলেন, যে-পৈশাচিক নৃশংস আসামীকে ধরবার ব্যাকুল বাসনায় প্রায় অন্ধ হয়ে আপনি কর্তব্য ভুলেছিলেন, বন্ধুবান্ধব পরিত্যাগ করেছিলেন, তাকেই আপনার সামনে হাজির করছি।

জজ। (মাথা নেড়ে আপন মনে) শান্তি নেই, শান্তি নেই।

আবদুস সাত্তার। শান্তি পাবেন, আপনার বাসনা একবার তৃপ্ত হলে শান্তি পাবেন। আপনার অশেষ কষ্ট-যন্ত্রণার শেষ হলো বলে। (দর্শকের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে পুঁথি পড়ার ভঙ্গীতে)

দিলজবা বুকের জেওর, আসল জবা রক্তময়
হামান-দিস্তায় নারীর হাত, ধুতরা পাতা বিষময়।
হায় রে হায়।

জনতা। (মঞ্চের অভ্যন্তর থেকে সমস্বরে)
হায় রে হায়!

জজ। (ক্ষীপ্রভঙ্গীতে উঠে দাঁড়িয়ে কানে হাত দিয়ে হুঙ্কার ছেড়ে) চুপ করো! চুপ করো!

জনতা। (থামে।)

আবদুস সাত্তার। এত বেচইন হবেন না, জজসাহেব! গন্তব্যস্থলের শেষ কয়েক পদক্ষেপ অতি কষ্টকর। এ সময়ে ধৈর্য-স্থৈর্যের বিশেষ প্রয়োজন।

জজ। (সংযত হয়ে শ্রান্ত কন্ঠে নতমুখে) তবে আদালত ডাকা হোক! কোথায় আসামী, কোথায় সাক্ষীসাবুদ?

আবদুস সাত্তার। (মঞ্চের পেছনে তাকিয়ে) আসামী! এসো, এগিয়ে এসো, জজসাহেবের হুকুম তামিল করো।

(পশ্চাতের অন্ধকার থেকে ধীরপদে আমেনা এগিয়ে আসে। পূর্ববৎ মুখ ভাবশূন্য। আলোর সীমানায় এসে আবছায়ার মধ্যে দাঁড়ায়। তিনজন গ্রামবাসী উত্তেজিতভাবে উঠে দাঁড়ায় তাকে দেখবার জন্যে। তারপর আবার বসে পড়ে। কিন্তু এবার কান-চোখ খোলা রাখে।)

জজ। (নতমুখে নীরস কন্ঠে) কোথায় আসামী?

আবদুস সাত্তার। (উৎফুল্ল কন্ঠে) চোখ তুলে দেখুন ঃ আপনারই সমক্ষে দাঁড়িয়ে আসামী! তাকিয়ে দেখুন তার পাপজর্জর মুখমণ্ডল, তার বিবেকশূন্য নিষ্ঠুর দৃষ্টি, তার ঘৃণাস্পদ অবয়ব।

জজ। (পূর্ববৎ ভঙ্গীতে এবং কন্ঠে) কি নাম আসামীর?

আবদুস সাত্তার। আমেনা! আমেনা খাতুন!

জজ। সাকিন-জেলা?

আবদুস সাত্তার। গ্রাম পীরপুর, থানা রাঙাদীঘি, জেলা ঢাকা।

জজ। অপরাধ কি আসামীর?

আবদুস সাত্তার। বলো আসামী তোমার অপরাধের কথা, দ্বিধা না করে বলো। জজ সাহেবকে ভয় করো না। তিনি অতিশয় দয়াবান। বলো, বলো তোমার স্বামীহত্যার কাহিনী।

জনতা। (অভ্যন্তর থকে সমবেতভাবে, অতি বিস্ময়) স্বামীহত্যা!

আবদুস সাত্তার। হ্যাঁ, স্বামীহত্যা। প্রথমে স্বামীহত্যা, তারপর সন্তানহত্যা। বলো, আমেনা, বলো তোমার জঘন্য, নিষ্ঠুর পাপের কথা, কিছু ঢেকো না। (দর্শকের দিকে তাকিয়ে) স্বামীর নাম কুতুব শেখ। মেদমাংস নেই, রোগাটে শরীর, কিন্তু কাজে-কর্মে বড় মন। শক্তি-সামর্থ নেই, কিন্তু নিয়াত কলমার বিষয়ে সদাসচেতন। বলো আমেনা, সে-মানুষ যখন নিদারুণ

রোগে শয্যাশায়ী, তখন কি করে তার জীবনাবসান ঘটিয়েছিলে।

জনতা। বলো আমেনা, বলো!

আবদুস সাত্তার। বলো কী করে শীলপাথরে বেটে ধুতরা পাতার বিষাক্ত রস তৈরী করেছিলে নিজের হাতে, কী করে সে-বিষ তুলে দিয়েছিলে অসহায়, বিশ্বাসী স্বামীর মুখে, কী করে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখেছিলে তার মরণ-যন্ত্রণা।

জনতা। (উত্তেজিতভাবে) বলো আমেন, বলো!

জজ। (আবার কানে আঙ্গুল দিয়ে) আদালতে কেন এত সোরগোল! সবাই খামোশ হোন! খামোশ, খামোশ!

আবদুস সাত্তার। (হাত তুলে) খামোশ! সবাই খামোশ হোন। আপনাদের প্রিয় বিচারকের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করবেন না।

জজ। (ভগ্ন, শ্রান্তকন্ঠে) আমাকে একটু শান্তি দিন, একট শান্তি দিন।

আবদুস সাত্তার। ভাই সকল, জজসাহেব আপনাদের কাছে শান্তি চান, তাঁকে শান্তি দিন। যিনি দুর্লঙ্ঘ পর্বত, দুর্গম পথ অতিক্রম করে লক্ষ্যস্থানে পৌঁছেছেন, অমানুষিক শ্রমকষ্টের সাহায্যে যিনি তাঁর বাসনা চরিতার্থ করেছেন, তাঁকে একটু শান্তি দিন।

(মঞ্চে নীরবতা আসে। আবদুস সাত্তার নিজের খাটে গিয়ে বসে। জজসাহেব নতমুখে নিথরভাবে বসে থাকেন। ক্রমশ ভিখারিণীর উপর ব্যতীত মঞ্চে ধীরে ধীরে সব আলো নিভে যায়। কয়েক মুহূর্তব্যাপী প্রগাঢ় শান্তি।)

ভিখারিণী। তাহলে আমিই বলি।

অদৃশ্য জনতা। (ফিসফিসিয়ে) তুমিই বল।

ভিখারিণী। রোগে মরণাপন্ন, তবু পেটে এক ফোঁটা ওষুধ নেই। কেবল তাবিজটা লকলক করে শীর্ণ বাহু থেকে। একদিন

স্বামীর কষ্ট সহ্য হয় না। তাই ধুতরা পাতার রস বানিয়ে তার কষ্টের শেষ করে। (থামে)

অদৃশ্য জনতা। (একটু নীরবতার পর) তারপর ?

ভিখারিণী। ধুতরা পাতায় তেমন বিষ নেই। তাই মরণ কি সহজে আসে ? স্বামীর অকথ্য যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে একদিন সন্ধ্যার সময় পানি আনার অছিলায় নদীর দিকে রওনা হলো। একটু পথ গিয়ে কাঁখের কলসীটা ভেঙ্গে ফেললো। কেন ?

অদৃশ্য জনতার মধ্যে একজন। নির্দয় ভাগ্যের উপর রাগ করে।

ভিখারিণী। না।

পূর্ব কন্ঠ। স্বামীর মরণদশা। কার জন্যে পানি আনবে ? তাই।

ভিখারিণী। না। কারণ কলসী নিয়ে কেউ ডুবে মরতে যায় না। নিজের প্রাণ নেবে স্থির করে সে কলসীটা ভেঙ্গে ফেলে

অদৃশ্য জনতা। (রুদ্ধশ্বাসে) তারপর ?

ভিখারিণী। কাঁখের কলসী ভেঙ্গে নদীর দিকে যাচ্ছে, এমন সময় শুনতে পায় তার মায়ের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ। কিছুক্ষণ সে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর বোঝে, অবশেষে তার স্বামীর কষ্টের শেষ হয়েছে। না মরে সে ঘরে ফিরে আসে।

পূর্ব কন্ঠ। স্বামীর মৃত্যু হলো তার দেয়া বিষে। ফিরে এলো কি করে ?

ভিখারিণী। তার-চারটে সন্তান। কি করে সে ? স্বামীর কষ্টে দিগ্বিদিকশূন্য হয়ে মরতে গিয়েছিলো। স্বামী আর বেঁচে নেই বুঝতে পারলে সন্তানদের কথা মনে পড়লো। মায়ের মন !

পূর্ব কন্ঠ। আমেনা তাহলে নিষ্পাপ।

জনতা। (সমবেত কন্ঠে) আমেনা, তুমি নিষ্পাপ!

ভিখারিণী। পাপ-পুণ্যের কথা নিয়ে আমেনা মাথা ঘামায় না। কার সাহস পাপ-পুণ্যের কথা তোলে তার সামনে? কার সাহস তাকে জিজ্ঞাসা করে কেন সে তার স্বামীকে বিষ দিয়েছে, কেন তার সন্তানের জান নিয়েছে? শুধু তারা একটি প্রশ্নই তাকে জিজ্ঞাসা করতে পেরেছে।

পূর্ব কন্ঠ। কী প্রশ্ন?

জনতা। কী প্রশ্ন?

ভিখারিণী। প্রশ্নটি এই যে, তুমি তোমার স্বামীকে এবং সন্তানকে খুন করেছ আমেনা? সে উত্তর দিয়েছে, করেছি। কথাটা অস্বীকার করার কোনই চেষ্টা করে নি। কেন করবে? কার জন্যে করবে?

পূর্ব কন্ঠ। আমেনা তাহলে অবোধ।

জনতা। (সমবেত কন্ঠে) আমেনা নিষ্পাপ, আমেনা অবোধ!

পূর্ব কন্ঠ। আমেনা নির্দোষ!

জনতা। আমেনা নির্দোষ!

পূর্ব কন্ঠ। আমেনা দোষাদোষ, পাপ-পুণ্যের বাইরে, কার সাহস তাকে তেমন প্রশ্ন করে?

জনতা। না, কারো সাহস নেই।

ভিখারিণী। কোন প্রশ্ন যদি থাকে তবে সে-প্রশ্ন মাতৃগর্ভের আদিম অন্ধকার থেকেই শুরু হওয়া উচিত। প্রশ্ন কী কোন বিশেষ হিজরী থেকে শুরু হয়? অটুট অভেদ্য অন্ধকার, নিরবচ্ছিন্ন সীমাহীন অন্ধকার। তারপর হঠাৎ কী দেখতে পায় আমেনা? চতুর্দিকে আলো, আলো: কেবল আলোর সমারোহ। আলো-উদ্ভাসিত পৃথিবী, সোনালী-কিরণের অন্তহীন নৃত্য, কুমুদের উপর টলমল

করা পানির ফোঁটায় স্ফটিকপ্রভা। চোখ কেবল ঝল্‌সে যায়। কিন্তু আলোর বিস্ময় ক্ষণস্থায়ী। (থামে)

জনতা। তারপর ?

ভিখারিণী। তারপর দেখতে-না-দেখতে আলোর প্রতি তার ঘৃণা জন্মায়। ক্রমশ প্রতি সূর্যোদয়, প্রতি বসন্তের অপরূপ পুষ্পসম্ভার, আলোকিত প্রতি মুহূর্তকে সে ঘৃণা করতে শুরু করে। একদিন তার মনে হয়, সে ঘৃণা বহির্মুখী না হয়ে অন্তর্মুখী হয়েছে। চূড়ান্ত ঘৃণার মুক্তিপথ যেন আদিম অন্ধকারের মধ্যেই, অন্তরের গহ্বরেই যেন তার সমাপ্তি। আমেনাকে ফাঁসিতে চড়াবার জন্যে আজ এত সাজ-সরঞ্জাম এত হুলুস্থূল, কিন্তু সে-আওয়াজ তার কানে পৌছায় না। যে-অন্ধকারে দূরতম তারারও আভাস নেই, যেখানে সৃষ্টির প্রাচীনতম শব্দও পৌঁছায় না, ইতিমধ্যে সেখানেই ফিরে গিয়েছে আমেনা।

প্রথম কন্ঠ। আলোকে যার ঘৃণা, ফাঁসিতে তার ভয় নেই। কে তাকে ভয় দেখাতে পারে ?

জনতা। (সমবেত কন্ঠে) কেউ ভয় দেখাতে পারে না।

প্রথম কন্ঠ। কে তাকে ছুঁতে পারে ?

জনতা। (সমবেত কন্ঠে) কেউ ছুঁতে পারে না।

ভিখারিণী। কারই বা সাহস তার জন্যে দুঃফোঁটা চোখের পানি ফেলে ?

জনতা। না, কারো সাহস নেই। আমেনা ! আমেনা !

(ভিখারিণীর উপর আলো নিভে যাবে। কয়েকমুহূর্তের জন্য সমগ্র মঞ্চ অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে।)

আবদুস সাত্তার। (হঠাৎ হাততালি দিয়ে) রোশনি কোথায় ? রোশনি চাই। (আবার হাততালি দেয়) রোশনি ! রোশনি !

(গোটা মঞ্চ আলোকিত হয়ে উঠবে। মঞ্চে গ্রামবাসী, ভিখারিণী, পুলিশ, আমেনা, যুবক এবং জজ যে যার স্থানে থাকবে। নিম্নোক্ত বক্তব্য উচ্চারণ করার সময় আবদুস সাত্তার দ্রুত গতিতে মঞ্চের সামনের ভাগে পায়চারি করবে এবং কয়েদীর পোশাকের উপর সাদা আলখাল্লা পরবে এবং মাথায় ফিকে সবুজ রঙের পাগড়ী বাঁধবে। দূরে ঢিমে তালে ঢোল বাজতে শুরু করবে।)

আবদুস সাত্তার। ভাই বেরাদার সমবেত ভদ্রমণ্ডলী, আমার ধৈর্যের সীমা আছে। দ্বিরুক্তি না করে অনেক সহ্য করেছি। কিন্তু আর সহ্য করা যায় না। এত নম্রতা, ক্ষমাশীলতা, আবেদন-নিবেদন, কাকুতি-মিনতির পরিণাম শুধু অনাচার-ব্যাভিচারের শক্তিলাভ। হৃদ্যতা, সহিষ্ণুতার মুখোশের প্রয়োজন শেষ হয়েছে। আমার মুখোশের প্রয়োজনই বা কি? আমি বিচারকের বিচারক, অন্যায়ের শাস্তিদাতা, দুর্নীতি-ব্যাভিচারের শাসক, শৃঙ্খলতার রক্ষক। সত্যের যে দণ্ডধারী তার বিনয়ের অবসর নেই। (জজের সামনে দাঁড়ায়, কয়েকমুহূর্ত তাকে চেয়ে দেখে। ঢোলের আওয়াজ থামে)। জজসাহেব!

জজ। (নির্বাক, চোখ পূর্ববৎ নিমীলিত।)

আবদুস সাত্তার। (মাথা নেড়ে কিছুটা ক্ষোভের সাথে) আপনার এ-পরিবর্তনের কারণ জানি না, কিন্তু আপনার জন্যে আমার দুঃখ হয়। একদিন আপনি আমাদের সকলের অপরিসীম শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। আপনার কর্তব্যজ্ঞান, মহত্ত্ব আর মনুষ্যত্বের জন্যে আপনি অতুলনীয় ছিলেন। আপনি আজ সে-মানুষ নন। এটি বড়ই দুঃখেরই কথা। তবু আমাকে কর্তব্য পালন করতেই হবে। না করে উপায় নেই। শুনছেন জজসাহেব?

জজ। (পূর্ববৎ নির্বাক।)

আবদুস সাত্তার। (আবার পায়চারি করে) আশ্চর্য, অত্যাশ্চর্য। মনে হয়, জজ আমাকে ঘৃণা করেন। (অবিশ্বাসের স্বরে হেসে)

ঘৃণা ! আমি তাঁর ঘৃণার পাত্র ! এ কথা কি তিনি জানেন না যে, সমাজের মধ্যে আমিই একজন মানুষ যাকে তিনি ঘৃণা করতে পারেন না ? (জজের দিকে তাকিয়ে ব্যাকুল কন্ঠে) কী হয়েছে আপনার কী করে আপনার বুদ্ধি-বিবেচনায় এমন বিশৃঙ্খলতার স্থষ্টি হয়েছে ? (আবার পায়চারি করে) অবিশ্বাস্য ! আমি, আবদুস সাত্তার নেওলাপুরী, তাঁর ঘৃণার পাত্র। কিন্তু ঘৃণা হলো কানা। ঘৃণা দিয়ে কোন সমস্যার মাধান হয় না। ঘৃণা দিয়ে যে সমস্যার সমাধান করা হয়, সে সমাধানও হয় কানা। (আবার দ্রুতপদে জজের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে) উত্তর দিন জজসাহেব, এমন উত্তর যা বোধগম্য এবং অর্থপূর্ণ হবে ! জজসাহেব !

জজ। (আপন মনে) শান্তি নেই, শান্তি নেই।

আবদুস সাত্তার। একবার অশান্তি স্থষ্টি করলে শান্তি পাওয়া দুষ্কর। পরিষ্কারভাবে বলুন কী আপনার উদ্দেশ্য। বলুন জজসাহেব !

জজ। (নিরুত্তর।)

আবদুস সাত্তার। দিনের পর দিন আপনার হাত দিয়ে খুনী-ডাকাতি, লম্পট-ব্যাভিচারী খালাশ পেয়ে যাচ্ছেঃ বলুন মুখ খুলে এ-অবিচারের আসল উদ্দেশ্য কি আপনার হাত-পা ধরে। অনুরোধ করছি, বলুন একবার !

জজ। (পূর্ববৎ নিরুত্তর।)

আবদুস সাত্তার। (একটু অপেক্ষা করে হতাশ ভঙ্গীতে অস্থিরভাবে পায়চারি করে। থেকে থেকে বিড়-বিড় করে)

ভিখারিণী। নির্বাক বিদ্রোহ। জজ টলবেন না, আপনার নির্দেশ কিছুতেই মানবেন না।

আবদুস সাত্তার। (আপন মনে, সজোরে) মস্তিষ্ক বিভ্রান্তি ! আর কিছু নয়, মস্তিষ্কে বিভ্রান্তি ঘটেছে ! (জজের দিকে চেয়ে) এও

কি সম্ভব? আমাদের প্রিয় জজ উন্মাদ হয়ে গেছেন? (আবার ক্ষীপ্রভাবে পায়চারি শুরু করে) না, এ দুনিয়া বড়ই আজব, তাতে রহস্যের শেষ নেই।

ভিখারিণী। কোন সমস্যার একবার যে-সমাধান পাও তাই আকড়ে ধরে থাক। যুগের পর যুগ। কেউ প্রশ্ন তুললে সে-প্রশ্নকে ঢাকবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা কর। বিস্ময় কি যে দুনিয়া এত রহস্যময়!

আবদুস সাত্তার। (জজের সম্মুখে গিয়ে হঠাৎ ধীরস্থির কন্ঠে) আমার দয়ার শরীর। ভেবেছিলাম সময় দিলে আদেশ উপদেশ দিলে আপনার মত বদলাবে, আপনার অহেতুক গোয়ার্তুমির শেষ হবে। অনেক সহ্য করেছি, আর পারি না। বৃথা আশায় আর দিন কাটানো যায় না। উদ্দেশ্য বুঝি না, কিন্তু আপনার এ বিপদজনক বীভৎস মস্করা সহ্যাতীত। আপনার মতিগতি ফিরবে বলে অপেক্ষা করে থাকলে সমাজের ভিত্তিই ভেঙ্গে পড়বে, তার মেরামত আর তখন সম্ভব হবে না। তখন আপনাকে নয়, আমাকেই জবাবদিহি দিতে হবে। আপনার সাথে অনেক খেলা খেলেছি, আর নয়। আপনারই মঙ্গলের কথা ভেবে অনেক টালমাটাল করেছি, অনেক সহনশীলতা দেখিয়েছি, আর পারা যায় না। বিদায় নিতে দুঃখ হয়, কিন্তু আমার বিবেকে সন্দেহ নেই, দোষাভাব নেই; চেষ্টায় আমার কোন ত্রুটি হয় নি। শুনছেন জজসাহেব?

জজ। (পূর্ববৎ নতমুখে নিরুত্তর থাকে।)

আবদুস সাত্তার। না, আমার চেষ্টায় কোন ত্রুটি হয় নি। কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। জজসাহেব বটগাছের মত গ্যাঁট হয়ে বসে আছেন, ক্ষীণতম শাখাটি পর্যন্ত নড়ে না। শাস্তি দিতে কারো কী আনন্দ হয়? কিন্তু দিতেই হয়। একটি নয়,

দুই-দুইটি নৃশংস হত্যা। অনাত্মীয় অপরিচিত কেউ নয়, নিজেরই সন্তান, নিজেরই স্বামী। তবু শুধু এব্যাপারেই যদি জজের একটা বদখেয়াল হতো, তাহলে চোখ বুজে থাকা যেতো। কিন্তু এটা অন্যতম ব্যাপার মাত্র। ঈমান আছে, দিলে ভয়-ডর আছে, বিষয়টির গুরুত্ব বুঝতে তাদের বিলম্ব হবে না। কী করি, এ অনাচার বন্ধ করতেই হবে। সবারই নিরাপত্তার জন্যে কাজটি আমাকে করতেই হবে।

(দ্রুতপদে আবদুস সাত্তার মঞ্চ পরিত্যাগ করবে। তার প্রস্থানকালে দ্রুততালে ঢোল বাজবে। মঞ্চ ক্রমশ সম্পূর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন হবে।)

ভিখারিণী। (অন্ধকারের মধ্যে থেকে, ঢোলের আওয়াজ থামার পর) যুদ্ধ লাগলো গো, যুদ্ধ লাগলো। দুর্বল যারা তারা আশ্রয় নাও, নারী-শিশু বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের নিরাপদ কর, অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের কথা ভেবে খাদ্যদ্রব্য যোগাড় কর। দেরী করো না গো, দেরী করো না!

(মঞ্চের বাইরে থেকে, গুরুগম্ভীর সমবেত কন্ঠের 'আল্লাহু, আল্লাহু' ধ্বনি শুরু হবে। একটু পরে আলো পড়বে মঞ্চের সামনে, মধ্যভাগে। সেখানে দাঁড়িয়ে বারিশ পীর। মোটাসোটা বৃদ্ধ লোক, মুখে বিস্তর দাড়ি, মাথায় কিশ্‌তি টুপি, হাতে তসবী। গায়ের জোব্বাটা জাঁক-জাকালো। সোজা মানুষের ভাবসাব মুখে)

বারিশ পীর। (দর্শকের দিকে তাকিয়ে সমবেত কন্ঠধ্বনির তালে-তালে) আল্লাহু, আল্লাহু। আল্লাহু, আল্লাহু। (কন্ঠধ্বনি থামলে) এক তাজ্জব খবর শুনে ছুটে এলাম। বললাম, তোমরা যাই বলো তাই করবো, কিন্তু একবার সচক্ষে দেখতে চাই। আপ্‌না আঁখু দিয়ে দেখতে চাই। সোজা কথা নয়, আমার ত্রিশ বছরের মুরীদ। দীর্ঘ ত্রিশ বছর। ভেবে ত্রিশ বছর কেন, আরো বেশী। প্রায় বত্রিশ বছর। পানির মত সময় বয়ে যায়। সে যা' হোক, পহেলা দফা আমার বাড়ীতে যখন তশরিফ নিয়ে আসেন

তখন তিনি জোয়ান মানুষ। বারিশের দিন ছিলো। (হঠাৎ মঞ্চের বাইরে বৃষ্টির আওয়াজ শোনা যাবে। সচকিত হয়ে উচ্চকন্ঠে) না, না, এখন নয়, এখন নয়। (বৃষ্টির আওয়াজ থামে। আবার দর্শকের দিকে চেয়ে লজ্জিতভাবে) আমার নাম বারিশ পীর। বারিশ আনার অলৌকিক ক্ষমতা আমার। শব্দটা উচ্চারণ করলেই বারিশ নাবে। যাহোক, কী বলছিলাম? (মনে পড়ে না) আল্লাহু, আল্লাহু।

সমবেতকন্ঠ। আল্লাহু, আল্লাহু!

বারিশ পীর। হ্যাঁ। মনে পড়েছে। পয়লা দফা তিনি যখন তশরিফ নিয় এলেন সেদিন সর্বত্র কাদা, কাদা; মানুষ জন্তু জানোয়ারের হাঁটু পর্যন্ত মিট্টি। তসবী পড়তে পড়তে এখন-তখন তাঁকে নযর করে দেখলাম। মুখে জবান নাই, কিন্তু চেহারায় রোশ্‌নি। নেকদিল আদমী যে সন্দেহ থাকলো না। নেকদিল মানুষকে পছানতে কভি দেরী হয় না।

ভিখারিণী। (অন্ধকার থেকে) সেদিন নেকদিল, আজো নেকদিল।

বারিশ পীর। (বিস্মিত হয়ে, মুখ ফিরিয়ে) এ্যাঁ? (কিছু না দেখে আবার দর্শকের দিকে তাকিয়ে) সেদিনই তাঁকে মুরীদ হিসেবে গ্রহণ করে নিলাম। কিন্তু আমার সে-মুরীদের কী হয়েছে? বড়ই তাজ্জবের কথা। তাই রাতবিরাতে ছুটে এলাম। তবে মানুষের দিলের কথা কে বলতে পারে? কাঁচের মত নাজুক মানুষের দিল। তাতে খারাবী আসতে কতক্ষণ? যিনি আমার বিশেষ প্রিয় মুরীদ ছিলেন, আজ তাঁর বড় বদনাম। তাজ্জব কথা! (একটু পায়চারি করেন তসবী পড়তে পড়তে। আবার আল্লাহু-আল্লাহু ধ্বনি ওঠে) অস্থির দিলের মানুষ এ-পীর সে-পীর করে। কোন কোন ব্যামারী যেমন এ-হেকিম সে-হেকিম করে। কিন্তু আমার প্রিয় মুরীদ জজসাহেব,

তেমন মানুষ নন। সে-জ ন্যই আজ আমার দিলে এতো পেরেশানি। (কন্ঠ কিছু নীচু করে) খোঁজ-খবর নিয়ে দেখেছি, অন্য কোন্ পীরের মুরীদ হন নাই। হলে এমত অবস্থায় ভালই হতো, আমার কিছু করবার থাকতো না। (উচ্চস্বরে) সে যা হোক, দিলে আমার পেরেশানির শেষ নাই। কী হয়েছে আমার প্রিয় মুরীদের?

ভিখারিণী। কিন্তু বড় নেক মানুষ। সেদিনও নেক, আজো নেক।

বারিশ পীর। এঁ্যা? হঁ্যা। ঠিক কথা। সেদিনও নেক, আজো নেক। মানুষ মুরীদ হলে পীরের দিলে বড় শোস্ত হয়। তাছাড়া পদমর্যাদার কথাভি আছে। দুই দিক ভালো থাকলে আদমীর কিমত হয়, পীরেরও ভালাই হয়! তাই দিলে আজ বড় আফশোস। কী করি বুঝি না। (আবার অস্থিরভাবে তসবী পড়েন আর পায়চারি করেন। আল্লাহু আল্লাহু ধ্বনি জাগে) কী করি? মুরীদদের বদনাম পীরেরও বদনাম।

ভিখারিণী। বদনাম হোক, কিন্তু নেকদিল মানুষ। সেদিনও, আজো।

বারিশ পীর। কিন্তু মানুষের দিলের কথা কে হলফ করে বলতে পারে? সবই খোদার মর্জি। তাছাড়া একটা কথা দোস্ত নেওলাপুরী আমাকে ইয়াদ করিয়ে দিলেন। বড়ই চালাক চতুর লোক এই নেওলাপুরী। সমঝদারও। খোদার খেয়াল, দুনিয়াদারীর খেয়াল, দুই দিকেই সমান। আমার মত নয়, দুনিয়াদারীর আমি কিছু বুঝি না। (হঠাৎ গলা নীচু করে) কিন্তু একটা কথা। দুনিয়াদারীতে এত খেয়াল থাকলে খোদার প্রতি খেয়াল কম হয়। বড় চতুর আদমী নেওলাপুরী, বড় চতুর! এত চতুর হওয়া ভালো নয়। (আবার গলা বাড়িয়ে) ঠিক নোক্সাই বাতিয়েছে নেওলাপুরী। সে বড়ই সমঝদার মানুষ।

ভিখারিণী। কী নোক্সা ?

বারিশ পীর। মুরীদের এত বদনাম, আমার উপায় নাই। কী করে তাঁকে আর মুরীদ রাখি ? কঠিন কথা, কিন্তু তাঁকে তা বলতেই হবে। (বিচলিতভাবে পায়চারি করে আবার। পশ্চাতে পুনরায় কন্ঠধ্বনি জাগে) আমার কসুর কি ? জজ-হাকিমের কাজকাম বুঝি না ঃ সে-সব দুনিয়াদারীর কথা। কিন্তু বদনাম আকাশ থেকে উতরায় না, দরখ্‌তেও গজায় না। কোন বাত ছাড়া কী এত বদনাম ওঠে ? তাছাড়া নেওলাপুরী হুঁশিয়ার লোক; বেহুদা কথা বলার লোক নয় সে। তবে একবার মুরীদের সঙ্গে না মিলে কী করে তাঁকে ছুটি দেই ? তিনি যদি ওয়াদা করেন যা কর্তব্য তা করবেন, তবে তো কথাই নাই। হাজার হলেও বত্রিশ বছরের মুরীদ ! (বিচলিত হয়ে) না, আমাকে জিজ্ঞাসা করতেই হবে। (এধার-ওধার চেয়ে) জজসাহেব ! জজসাহেব !
(মঞ্চে আলো নিভে যাবে। আবার ঢোলের আওয়াজ শোনা যাবে।)

ভিখারিণী। (অন্ধকার থেকে, ঢোলের আওয়াজ থামলে) লড়াই লেগেছে গো, বিষম লড়াই লেগেছে। দুর্বল যারা, কোমলচিত্ত যারা, কাপুরুষ যারা তারা আপন আপন জান বাঁচাও, আপন আপন বিষয়বস্তু রক্ষা করো ! বিলম্ব করো না !
(আবার আলো পড়লে দেখা যাবে বারিশ পীর অতিশয় বিচলিতভাবে পায়চারি করছেন এবং আপন মনে দ্রুত-গতিতে বিড়বিড় করছেন।)

বারিশ পীর। তাজ্জব ব্যাপার ! সাফাই গাইবার বা বদনামের কারণ অস্বীকার করার চেষ্টা নাই, কেবল বললেন, রাত হয়েছে, ঘরে ফিরে যান। না, আসমানে বা দরখ্‌তে বদনাম গজায় না।

ভিখারিণী। নেওলাপুরীর নোক্‌সার কথা বলেন নি তাঁকে?

বারিশ পীর। বলতেই হয়েছে। না বলে উপায় কী। কিন্তু তাজ্জবের কথা, একবারও তিনি প্রতিবাদ করলেন না। একটু হেললেন না, মনের কথাভি বললেন না। বললাম, লোকে যা বলে তাই করুন, না হলে আপনার লোকসান পোঁছাবে। কেবল বললেন, মুরীদানা থেকে বরখাস্ত দিয়ে কর্তব্যপালন করেছেন, এবার বাড়ী যান। (হঠাৎ কাতর কন্ঠে) খোদা সাক্ষী! আমি কোশিস করেছি। না, আমার কোন কসুর নাই। কিন্তু আমার দিলে বড়ই পেরেশানি। আমার বত্রিশ বছরের মুরীদ, যাঁকে আমি আমার সহোদর ভাই-এর মত দেখেছি! (মনে হয় চোখ যেন পানি আসে।)

ভিখারিণী। বিলাপ করে আর কী লাভ। যান, বাড়ী ফিরে যান।

বারিশ পীর। (ফিরে বিহ্বলভাবে অন্ধকারের দিকে তাকায়; তারপর দোয়া-দরূদ পড়তে পড়তে দ্রুতগতিতে নিষ্ক্রান্ত হয়)

ভিখারিণী। যেন আসল শয়তানের আলিঙ্গন থেকে মুক্তি পেলেন। (তিনজন গ্রামবাসীর উপর আলো পড়বে। একজন ক্ষীপ্রভঙ্গীতে উঠে দাঁড়িয়ে এধার-ওধার তাকাবে।)

ভিখারিণী। কিহে, সময় উপস্থিত হয়েছে না কি?

দণ্ডায়মান গ্রামবাসী। জজসাহেব!

ভিখারিণী। জজসাহেবকে কেন ডাকছো?

দণ্ডায়মান গ্রামবাসী। জজসাহেব! গরীব মূর্খের কথা হেলা করবেন না।

একজন সঙ্গী। (থু থু ফেলে) যে-মানুষকে খোদার লোক ছেড়ে গেলো তাঁর কাছে আবার প্রার্থনা! আকাশের চাঁদ চাও!

প্রথম ব্যক্তি। আমেনা যাকে খুন করেছে আমরা তার ভাই। আমরা কুতুব শেখের ভাই। আমাদের দাবী, খুনের ন্যায্য বিচার হোক।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। (মুখ বাঁকিয়ে) যার ন্যায়পরতা নেই তার কাছে আবার ন্যায্য বিচার চাওয়া।

প্রথম ব্যক্তি। চাষাভূষা দুঃখী-মানুষের কথা উপেক্ষা করবেন না। তাদেরও দাবী-দাওয়া আছে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে নালিশ আছে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। আমাদেরও রক্তমাংসের শরীর, আমাদেরও বোধশক্তি আছে, মানমর্যাদাজ্ঞান আছে। প্রতিহিংসার ক্রোধে আমাদের রক্তেও আগুন ধরে।

ভিখারিণী। কাকে ফাঁকি দিচ্ছ? দাবী-দাওয়ার কথা বলবার জন্যেই কি এখানে গুঁড়িসুড়ি দিয়ে বসে আছ?

দ্বিতীয় ব্যক্তি। (দণ্ডায়মান সঙ্গীর চাদর ধরে টেনে) বস, বস, (লোকটি বসে পড়ে)।

ভিখারিণী। (আপন মনে) অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় কি। কান খুলে চোখ মেলে নিঃশব্দে বসে অপেক্ষা করা যাক। যুদ্ধের হালচাল বোঝা শক্ত। আসল যুদ্ধ কি প্রকাশ্যে হয়? (কয়েক মুহূর্ত নীরবতার পর ঝড়ের বেগে উকিল প্রবেশ করে। চেহারা উত্তেজিত। যেন সোজা রণক্ষেত্র থেকে এসেছে।)

উকিল। (সজোরে) জজসাহেব! জজসাহেব!
(জজের উপর আলো পড়বে।)

জজ। (আলোর জন্যে ভ্রূকুটি করে তাকিয়ে) কে?

উকিল। (জজের সামনাসামনি হয়ে তাঁর পদমর্যাদার কথা স্মরণ করে নম্র হয়ে) আশা করি আপনার আরামের ব্যাঘাত করলাম না, জজসাহেব!

জজ। (শ্রান্তকন্ঠে) আরাম! কে আমাকে আরাম দিচ্ছে!

উকিল। মাফ করবেন, কিন্তু একটা গুরুতর ব্যাপারে এমন অসময়ে আমাকে আসতেই হলো।

জজ। (কিছুটা উৎফুল্লভাবে) ভালোই হয়েছে এসেছেন। কিছু গল্পগুজব করা যাক।

উকিল। (ইতস্ততঃ করে) না, গল্পগুজবের সময় নেই জজসাহেব। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর। কথা হচ্ছে, উকিল সম্প্রদায়ের মুখপাত্র হয়ে আপনার কাছে এসেছি, তাদের পক্ষ থেকে একটা অভিযোগপত্র নিয়ে। (পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে।)

জজ। অভিযোগপত্রের কথা পরে হবে, প্রথমে বসুন তো একটু।

উকিল। (না শুনে) আমার অবস্থাও বুঝে দেখবেন। পেশাদার মানুষ, সহযোগীদের ঐক্যমতের বিরুদ্ধে কী করে দাঁড়াই ?

জজ। আগে বসুন তো দেখি। একটু চা-পান ধূমপান করুন।

উকিল। (সজোরে মাথা নেড়ে) আপনি বুঝতে পারছেন না। ব্যাপারটা অতিশয় গুরুতর। অভিযোগপত্রটা প্রথমে পড়ে শুনাই, শুনুন। (কাগজ তুলে ধরে পড়বার জন্য।)

জজ। (উৎফুল্লতা হারিয়ে) রাত কত হলো ?

উকিল। (পূর্ববৎ না শুনে) আমাকে অবশ্য দস্তখত দিতেই হয়েছে। পরস্পরের মধ্যে পেশাগত হিংসা-বিদ্বেষ, মতভেদ, ঝগড়া-লড়াই থাকলেও সবাই যখন এক কন্ঠে কথা বলে তখন একটি মানুষের পক্ষে বেসুরো রব তোলা দুষ্কর।

জজ। (না শুনে) অনেক রাত হবে। কিন্তু ঘুমটা হলো না।

উকিল। (হঠাৎ মিনতি করে) জজসাহেব, অভিযোগপত্রটা পড়ি, শুনুন। কী বলবো, এ অভিযোগপত্রটি আপনারই বিরুদ্ধে !

জজ। (কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে গম্ভীরকন্ঠে) তবে শোনাবেন বৈকি ! পড়ুন।

উকিল। (সঙ্কোচের সঙ্গে কাগজটা নাড়ে-চাড়ে, একটু কাশে, তারপর চোরা-চোখে জজের দিকে তাকায়)

জজ। আদ্যোপান্ত না পড়ে সারমর্ম বলুন। বেহুদা কথায় আষ্টে-পৃষ্টে বাঁধা থাকে বলেই ক্বচিৎ ঐসব অভিযোগপত্র অর্থপূর্ণ হয়।

উকিল। (অকারণে উৎসাহিত হয়ে) সত্যি কথা বলেছেন জজসাহেব। সারমর্মই বলবো, ইঙ্গিতে বলা কথা খোলাসা করে বলবো, শব্দ-বাক্যের কুঞ্ঝটিকা থেকে উদ্ধার করে নগ্ন ভাষায় পেশ করবো। সেটাই সহজ হবে। (আবার কাগজটা নাড়ে চাড়ে, কিন্তু মুখ থেকে শব্দ বের হয় না)

জজ। কী হলো?

উকিল। ভাষার অলঙ্কার ছাড়া বড়ই নগ্ন মনে হচ্ছে যেন। এখন বুঝতে পারছি অভিযোগপত্রে ভাষার কেন এত লীলাখেলা থাকে। জ্ঞান প্রকাশের জন্যে নয়, চক্ষুলজ্জার জন্যে। তা লজ্জার আবরণ। (একটু থেমে, সজোরে নিঃশ্বাস নিয়ে জজের দিকে তাকিয়ে) এক কথায়, আপনার উপর উকিল সম্প্রদায় আস্থা হারিয়েছে। আপনার বিচার করবার ক্ষমতার উপর তারা সমস্ত আস্থা হারিয়েছে। এই হচ্ছে সারমর্ম। (হঠাৎ আবেগাচ্ছন্ন হয়ে মুখ ঘুরিয়ে) আমাদের গণ্যমান্য শ্রদ্ধেয় বিচারকের উপর তাদের কোনই আস্থা নেই! তরুণ-বৃদ্ধ, অভিজ্ঞ-অনভিজ্ঞ, সত্যবান-অসত্যবান—প্রত্যেক উকিলই এই অভিযোগপত্রে স্বাক্ষর দিয়েছে। কারো দ্বিমত হয় নি, কারো একটু দ্বিধা হয় নি, কারো মনে একটু সন্দেহ জাগে নি। সন্দেহ বা দ্বিধা হলেও স্বাক্ষরে তার বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই। (হাতের কাগজটি বাড়িয়ে উচ্চকন্ঠে) দেখুন, তাকিয়ে দেখুন: স্বাক্ষর দিতে আমার হাত কেঁপেছে কি একবার, তাতে কোন প্রশ্নের আভাস পড়েছে কি? দেখুন, দেখুন!

জজ। (আপন মনে) আমিও অনেক জীবন-মৃত্যুর ব্যাপারে স্বাক্ষর দিয়েছি। আমারও হাত কাঁপে নি। স্বাক্ষর হলো আঙ্গুলের কীর্তি: অন্তরের কথা কি সব সময়ে তাতে প্রকাশ পায়? তবে জানতাম না। তখন সন্দেহ পর্যন্ত

ছিলো না। জানা না-জানার যেখানে মিলন হয় সেখানেই সন্দেহের জন্মস্থান। অন্তর বেদনারও শুরু হয় সেখানেই। কিন্তু তখন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতাম। দৃঢ় বিশ্বাসীর হাত কাঁপে না কখনো।

উকিল। অভিযোগটি মানি না, কিন্তু স্বাক্ষর দিয়ে তা সমর্থন করেছি। তার জন্যে দুঃখ হলেও সে দুঃখ প্রকাশ করে লাভ নেই। একটি মানুষের পক্ষে বিদ্রোহ করা সম্ভব নয়, সহযোগিদের পরিত্যাগ করাও কঠিন। হ্যাঁ, আমি স্বাক্ষর দিয়েছি। আমার হাত কাঁপে নি স্বাক্ষর দিতে।

জজ। (আপন মনে) হাত কাঁপবে কেন? কার হাত কাঁপে? বলি নি, আমারও হাত কাঁপে নি কখনো।

উকিল। এ অভিযোগপত্র উচ্চ আদালতে পাঠানো হবে। সকলের বিশ্বাস, উচ্চ আদালত এই অভিযোগ উপেক্ষা করতে পারবে না। আপনার পদচ্যুতি হবে। (থেমে হঠাৎ বেদনার্ত কন্ঠে) জজসাহেব, কেন আপনি নিজের সর্বনাশ করছেন? কী আপনার উদ্দেশ্য?

জজ। (আপন মনে) সর্বনাশ? কার সর্বনাশ? আঘাতের পর ক্রোধ এলে আঘাতে ব্যথা থাকে না। বিশ্বাসের ভিত্তি ধূলিসাৎ হলে নিরলম্ব মনে ভয়-আশঙ্কা থাকে না।

উকিল। এখনো সময় আছে। একবার হ্যাঁ বললেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

জজ। (পূর্ববৎ আপন মনে) নানাভাবে তারা ভয় দেখাচ্ছে। কিন্তু জানে না যে, তাদের প্রতি চেষ্টাই কেবল আগুনে ইন্ধন যোগাচ্ছে।

উকিল। একে একে সবাই আপনাকে ছেড়ে যাচ্ছে। ইচ্ছা না হলেও বাধ্য হয়ে ছেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু একবার হ্যাঁ বললেই তারা ফিরে আসবে জজসাহেব।

(দূরে ক্ষীণভাবে জনতার কোলাহল শোনা যায়।)
(শুনে উত্তেজিতভাবে) শুনছেন জজসাহেব। শহরে গোলযোগ শুরু হয়েছে। জজসাহেব!

জজ। (একবার কান পেতে কোলাহল শোনে, তারপর মাথা নত করে।)

উকিল। (শঙ্কিতভাবে কোলাহল শোনে) শুনছেন জজসাহেব? যেন মানুষের আওয়াজ নয়, ভাষাও যেন বোঝা সম্ভব নয়। কিন্তু এখনো হয়তো সময় আছে, এখনো সে-ভয়াবহ দুর্বোধ্য আওয়াজ থামানো যায়। জজসাহেব!

জজ। (পূর্ববৎ নতমাথায় নীরব হয়ে থাকেন।)

উকিল। (কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে নিরাশকন্ঠে) তবে যাই। যিনি চারধারে আগুন জ্বালিয়ে মাঝখানে কাঠের মূর্তির মত নিশ্চলভাবে বসে থাকেন নিজেকে ধ্বংস করার জন্যে, তাঁকে কে বাঁচাতে পারে?
(শেষবারের মত জজের দিকে তাকিয়ে ধীরে-ধীরে বেরিয়ে যায়। দূরে কোলাহল আরো জোরালো হয়ে ওঠে। তারপর কিছুক্ষণের জন্য একটু থেমে পড়ে।)

ভিখারিণী। যুদ্ধের লেলিহান শিখা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছেঃ সে আগুন কে ঠেকাতে পারে? সবুজ তৃণদল, কুসুমিত পুষ্পপল্লব তার উষ্ণ নিঃশ্বাসে জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে, হৃদয়ের কোমলতা, স্নেহ-মমতা তার তাপে ঝলসে যাচ্ছেঃ কে গতিরোধ করতে পারে এ ধ্বংসলীলার?
(এ উক্তির উত্তরেই যেন জনতার কোলাহল আবার বাড়ে। গ্রামবাসীদের মধ্যে চঞ্চলতা। তারা কান পেতে শোনে। একজন উঠে দাঁড়ায় ক্ষিপ্রগতিতে।)

ভিখারিণী। (গ্রামবাসীদের লক্ষ্য করে) দেখ, চেয়ে দেখ! হঠাৎ তাদের নাসিকা বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে, চোখে এসেছে তীক্ষ্ণতা।

যেন হিংস্র জানোয়ার শিকারের গন্ধ পেয়েছে। (তাদেরকে উদ্দেশ করে) কি হে, এবার সময় উপস্থিত হয়েছে বুঝি ?

দণ্ডায়মান ব্যক্তি। (অতিশয় উত্তেজিতভাবে অদৃশ্য জনতাকে) এই যে, এখানে আমরা!
(বাকী দুইজন গ্রামবাসীও দ্রুতভঙ্গীতে উঠে দাঁড়ায়। সমগ্র মঞ্চ আলোকিত হয়ে উঠে।)

গ্রামবাসিগণ। (সমস্বরে) এই যে আমরা এখানে, কুতুব শেখের তিন ভাই। আমরা এলাম বলে।

প্রথম ব্যক্তি। আসামীও এখানে। তার পালাবার পথ নেই।

গ্রামবাসিগণ। (সমস্বরে) আসামীকে নিয়ে আমরা এলাম বলে।
(মঞ্চের বাইরে জনতার সমবেত চীৎকারধ্বনি উত্তাল হয়ে উঠবে। গ্রামবাসিগণ দ্রুতপদে আমেনার দিকে যাবে, তারপর তার হাত ধরে বেরিয়ে যাবে। আমেনা কোন প্রতিবাদ করবে না। জনতার চীৎকার-ধ্বনি ক্রমশ দূরে মিলিয়ে যাবে।)

পুলিশ। (নীরবতা ফিরলে দার্শনিকোচিত কন্ঠে) খোদা! খোদা! আপ ভালা তো দুনিয়া ভালা। (জজের কাছাকাছি এগিয়ে এসে জজকে উপেক্ষা করে বিড়ি ধরায়। তার হাত কাঁপা সকলের চোখে পড়বে। তারপর সমস্ত মঞ্চ অন্ধকারাচ্ছন্ন হবে। নীরবতার মধ্যে আবার কুকুর ছানার মর্মান্তিক আর্তনাদ শোনা যাবে)

ভিখারিণী। (কিছুক্ষণ পর) ধ্যাৎ! জ্বালিয়ে মারলে! (আলো পড়বে তার উপর। দেখা যাবে উবু হয়ে বসে আছে।)

যুবক। কী হলো ? (আলো পড়বে তার উপর। সে দাঁড়িয়ে)

ভিখারিণী। ভাগ্য ভালো, আমার যুবকবন্ধু সশরীরে হাজির হয়েছে। কী আবার হবে ? বড় মশা গো! জ্বালিয়ে খেলো!

যুবক। মারো না কেন?

ভিখারিণী। স্বপ্ন ভেঙ্গে যাবে। দুঃস্বপ্নও স্বপ্ন।

যুবক। (বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে) ঘুম ছাড়া স্বপ্ন হয় না।

ভিখারিণী। তুমি আমার নিশিথ রাতের চন্দ্রমণি, কিন্তু তোমার বুদ্ধি একটু ভারী।

যুবক। (মুখ কালো করে) চপলতা করো না।

ভিখারিণী। শ্রদ্ধেয় তিরস্কার দাতা, চপলতার প্রয়োজন আছে। চপলতা হলো সুস্বপ্নের নৃত্য-ঝঙ্কার।

যুবক। তুমি বললে দুঃস্বপ্ন দেখছ।

ভিখারিণী। দুঃস্বপ্নের সময়ই মানুষ সুস্বপ্নের স্বপ্ন দেখে।

যুবক। (সজোরে মাথা নেড়ে) আগড়-বাগড় কথা। (দূরে আবার জনতার চীৎকারধ্বনি শোনা যায়। সভয়ে কান পেতে শোনে) না, আশা নেই। আশা করা বৃথা।

ভিখারিণী। (সোজা হয়ে বসে) সময় ঘনিয়ে আসছে। মুদ্দত শেষ হলো প্রায়। সর্বত্র যে-আগুন জ্বলে উঠেছে, তাতে সর্বশেষ মুক্তিনামাও পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

যুবক। (সরে এসে) চীৎকার থামে না কেন?

ভিখারিণী। (সকৌতুকে তাকিয়ে) ভয় হচ্ছে বুঝি? না, তোমার-আমার ভয় কিসের? কেউ আমাদের স্পর্শ করবে না।

যুবক। (সভয়ে কোলাহল শোনে, উত্তর দেয় না।)

ভিখারিণী। (হঠাৎ স্নেহার্দ্র কন্ঠে) এসো, কাছে এসো।

যুবক। (একবার ভিখারিণীর দিকে তাকায়, কিন্তু নড়ে না)

ভিখারিণী। (বিরক্তির সঙ্গে) যাও, মায়ের কোলে ফিরে যাও।

যুবক। (ছোট গলায় সলজ্জ কন্ঠে স্বীকার করে) আমার একটু ভয় করছে।

ভিখারিণী। (আপন মনে, দুঃখের সঙ্গে) ভয়-আশঙ্কা হতে কে না পালাতে চায় স্নেহ-মমতার নিরাপদ আশ্রয়ে? কিন্তু আশ্রয় নেওয়া সোজা কথা নয়। মধ্যে প্রান্তর, ধূ-ধূ করা দুর্বা-উদ্ভিদ গাছপালাশূন্য প্রান্তর। সে-প্রান্তর পার হওয়া সোজা কথা নয়। গন্তব্যস্থানে পৌছুবার আগেই তৃষ্ণায় মৃত্যুলাভ হয়। তোমার ভয়ে আমার মন নরম হলো, কিন্তু তুমি কী সে প্রান্তর পার হতে পারলে?

যুবক। (হঠাৎ নিজেকে সংযত করে) আমার ভয় কেটেছে।

ভিখারিণী। (না শুনে আপন মনে) না, সে ধূ-ধূ করা প্রান্তর অতিক্রম করা সোজা কথা নয়। বুকে হাহাকার নিয়ে বসে থাকাই ভাল। কেন প্রাণ দেয়া মিছামিছি? কে বলে ওপারে আশ্রয়, নিরাপত্তা? সব আলেয়া!

যুবক। জনতা যেন শান্ত হয়েছে।

ভিখারিণী। (পূর্ববৎ না শুনে আপন মনে) জজসাহেব চেষ্টা করছেন সে-প্রান্তর পার হতে। তাঁর প্রান্তরের ওপারে নির্বাক শ্বেতবসনা আমেনা। একাই তিনি চলেছেন। আর তারা সবাই কিনারে দাঁড়িয়ে দেখছে। সবাই স্বাক্ষর দিয়ে দলবদ্ধ হয়েছে। প্রান্তরকে তারা জিব্রাইলের মত ভয় করে।

যুবক। (ইতস্ততঃ করে) সে-প্রান্তর পার হতে পারবেন তিনি?

ভিখারিণী। না গো, না। আগেই তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাবে। প্রান্তরের কিনারে দাঁড়িয়ে সংঘবদ্ধদল সে-দৃশ্য দেখবার জন্যেই অপেক্ষা করছে। সে-দৃশ্য যখন দেখবে তখন পরস্পরকে অভিনন্দিত করবে আর তার বিরুদ্ধে তাদের স্বাক্ষরকে স্বর্ণমণ্ডিত করবে। বিজ্ঞতা এবং পারদর্শিককতার জন্যে তখন তাদের দম্ভের সীমা থাকবে না, তৃপ্তিতেও গদগদ হয়ে উঠবে। কিন্তু সেখানেই বিজয়ী

বীররা ক্ষান্ত হবে না। প্রান্তরের মধ্যে তৃষ্ণায় যাঁর মৃত্যু হবে, তাঁরই খড়ের মত শুষ্ক দেহে তখন তারা আগুন দেবে। অতি উল্লাসে চিড়চিড় করে আকাশ ভেদ করে উঠবে সে অগ্নিশিখা। বিজয়ীর উল্লাসের স্বরূপ জানো না।

যুবক। (হঠাৎ ভেঙ্গে পড়ে হাতে মুখ ঢাকে।)

ভিখারিণী। (সামান্য অবিশ্বাসের সঙ্গে তার দিকে তাকায়। তারপর স্নেহসিঞ্চিত কন্ঠে) এসো, এসো আমার কাছে।

যুবক। (নড়ে না।)

ভিখারিণী। (তিক্তভাবে, আপন মনে) মহাপ্লাবন হোক, পৃথিবীব্যাপী অগ্নিকাণ্ড হোক, নিদারুণ ভয়ে বা গভীর নিরাশায় রক্ত হিমশীতল হোক, তবু নির্দিষ্ট সীমানা অতিক্রম করার সাহস কার হয়? ভালো ভালো। এসো না। (হাঁটুতে মুখ ঢাকে।)

[কয়েক মুহূর্ত নীরবতা। জনতার কোলাহল কাছাকাছি কোথাও ঝড়ের মত ভেঙ্গে পড়ে। ক্ষীপ্রগতিতে মুখ তুলে ভিখারিণী যুবকের দিকে তাকায়। যুবক সভয়ে কোলাহল শোনে।]

ভিখারিণী। (কোলাহল থামলে হাঁটুতে গাল রেখে) ভয়ে কাঠ হয়ে যাবে, আগুনে দগ্ধ হবে, তবু ভুলবে না। কেউ ভোলে না।

[আবার জনতার কোলাহল। সে-কোলাহল এবার উত্তালরূপ ধারণ করবে। দরজায় করাঘাত।]

ভিখারিণী। (সন্ত্রস্তকন্ঠে) এসো এসো, এসো আমার কাছে। তোমাকে ওরা খুন করে ফেলবে! ভুলে যাও আমি কে, তুমি কে। এসো একবার! জানো, আমারও ভয় হয়, আমারও ইচ্ছা হয় কোথাও আশ্রয় নেই।

যুবক। (নিদারুণ ভয়ে চোখ বিস্ফারিত করে যেদিক থেকে আওয়াজ আসে সেদিকে চেয়ে থাকে, ভিখারিণীর ডাক শোনে না।)

[দরজায় সজোরে করাঘাত! একটু পরে টলতে টলতে মতলুব আলী মঞ্চে প্রবেশ করে। বেশভূষা এলোমেলো, চেহারা উদ্‌ভ্রান্ত। সে যখন কথা বলবে ভিখারিণী তখন হাঁটুতে মুখ গুজে বসে থাকবে।]

মতলুব আলী। (পাগলের মত) জজ! জজসাহেব! কোথায় আপনি জজসাহেব?

[জজের উপর আলো পড়বে। পূর্ববৎ নত মাথায় খাটে বসে]

জজ। (গভীর ঘুম থেকে জেগে ওঠার ভঙ্গীতে চোখ সঙ্কুচিত করে মতলুব আলীর দিকে তাকায়, কিছু বলে না)

মতলুব আলী। আমি, আমি জজসাহেব। আমি মতলুব আলী। (রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে) জজসাহেব, সর্বনাশ হয়ে গেছে। যাকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন, সে আর বেঁচে নেই! (জনতার কোলাহলে কান দিয়ে) শুনছেন? রক্তপাগল জনতার আর্তনাদ শুনছেন? আমেনাকে খুন করেও তাদের তৃপ্তি হয় নি। আরো রক্তের জন্য তাদের তৃষ্ণা বেড়েছে।

জজ। (শোনে; একটু বিহ্বলতা। তার পর ধীরে ধীরে মাথা নত করে।)

মতলুব আলী। (কিছুটা সংযত হয়ে) তাকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম, কিন্তু একা মানুষ কী করি, কে আমার কথা শোনে! কী উন্মাদনা, কী হিংস্রতা, যদি দেখতেন! একটি দুর্বলা মেয়েমানুষ, নড়চড় নই, মুখে কথা নেই, প্রতিবাদ নেই, আত্মরক্ষার চেষ্টা নেই—তার জীবন নিতে কতক্ষণ?

(যুবক বিস্ফারিত নেত্রে মতলুব আলীর দিকে তাকিয়ে থাকে। জজ পূর্ববৎ বসে থাকে। একটু পরে ভিখারিণী হঠাৎ একটু হাসে বলে মনে হয়।)

মতলুব আলী। জজসাহেব!

জজ। (নিরুত্তর)

ভিখারিণী। কেন জজসাহেবকে বিরক্ত করছো?

মতলুব আলী। এবার কী হবে জজসাহেব?

ভিখারিণী। (মুখ তুলে ধম্‌কে) আর কী হবে? তুমি থামো বাবা!

মতলুব আলী। (কিছুটা হতভম্ভ হয়ে নীরব থেকে তারপর) কিন্তু আমেনা আর বেঁচে নেই যে! (যুবককে, তারপর ভিখারিণীকে) বুঝতে পারছো কথাটা? আমেনাকে তারা খুন করেছে। (থেমে) কেউ কথা বলছো না কেন? (তারা উত্তর দেয় না। এবার জজকে) জজসাহেব! নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড কি একমাত্র প্রতিফল ছিলো? কিছু একটা বলুন! জজসাহেব! জজসাহেব!

জজ। (পূর্ববৎ নির্বাক)

ভিখারিণী। (মুখ তুলে খনখনে গলায়) কেন ঘ্যানঘ্যান করছো? ভাবছো বুঝি যা হবার তা হয়েছে, এবার জজের প্রতি একনিষ্ঠতা দেখিয়ে কিছু লাভবান হবে? লালসার শেষ নেই। যাও যাও, পৃষ্ঠপ্রদর্শন করো।

[মতলুব আলীর বিহ্বলতা আরো বাড়ে। হাবাগোবার মত একবার ভিখারিণীর দিকে, আরেকবার জজের দিকে তাকিয়ে বেরিয়ে যায়। চলনে পরম দুর্বলতা। অদৃশ্য হবার আগে হঠাৎ তীব্র ঘৃণায় মেঝে সজোরে থুথু ফেলে। যুবক পেছনে সরে গিয়ে দর্শকের দিকে পিঠ দিয়ে অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে থাকে। ভিখারিণী এবং জজের বসার ভঙ্গীতে কোন তারতম্য হবে না। দূর কোলাহল মিলিয়ে যাবে। কিছুক্ষণ মঞ্চে প্রগাঢ় নীরবতা। কুকুর-ছানাটি পর্যন্ত নিশ্চপ। তারপর ধীরে ধীরে মঞ্চ অন্ধকার হবে।]

ভিখারিণী। (আস্তে) এই তো সেই অন্ধকার, কালো-কাজল আদিম অন্ধকার। এ-অন্ধকারে কী শান্তি! তার গহ্বরে যে অন্ধ জীবন তার যাত্রা নেই, শুরু নেই; সেখানে প্রশ্ন নেই, ভয় নেই, আশা নেই, নিরাশা নেই। (থামে, আবার নীরবতা। কার পদধ্বনি শোনা যাবে। তীক্ষ্ণভাবে) কে ওখানে? কে?

আবদুস সাত্তার। (সন্তর্পণে) জজসাহেব! (অপেক্ষা করে আবার, এবার গলা একটু চড়িয়ে) জজসাহেব!

ভিখারিণী। (তীক্ষ্ণভাবে) কে? কে ডাকে জজসাহেবকে? (আবদুস সাত্তারের উপর স্বল্পপরিধির চক্রাকার আলো পড়বে)

আবদুস সাত্তার। (ভিখারিণীকে উপেক্ষা করে) জজসাহেব! কোথায় আপনি?

(ভিখারিণীর উপর এবার আলো পড়বে। তার চোখ ক্রোধে ঝলসায়।)

ভিখারিণী। (গুরুগম্ভীর কন্ঠে) কেন এসেছেন আবার? এখনো সাধ মেটে নি বুঝি?

আবদুস সাত্তার। (পূর্ববৎ উপেক্ষা করে) শুনছেন জজসাহেব?

ভিখারিণী। (হঠাৎ মর্মান্তিকভাবে আহত মানুষের মত শরীর মাটিতে টেনে টেনে আবদুস সাত্তারের দিকে অগ্রসর হতে হতে) আপনাকে বলেছি, না! না! শতবার না! সাবধান, উত্তপ্ত মরুভূমি পার হতে গিয়ে পরম ধার্মিকেরও জীবনাবসান হয়, কিন্তু আমি অবলীলাক্রমে পার হয়ে যাই। আমার হিংস্রতা ভয়াবহ, কারণ দোজখে আমার ভয় নেই, ছোয়াব-পুণ্যে আমার সাধ নেই। সাবধান বলছি!

আবদুস সাত্তার। (বিচিত্র ভঙ্গীতে আসতে থাকা নারীর দিকে একবার একটু বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে গলা উঁচু করে) আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? জজসাহেব!

ভিখারিণী। না, না, না। বলেছি, সাবধান! দেখতে না পান, কিন্তু

আমার দাঁতে ধার, আমার সূচালো নখে বিষ। প্রাণের ভয় থাকলে সাবধান হোন!

আবদুস সাত্তার। (এবার ভিখারিণীর দিকে একবার কিছুটা বিরক্তির সঙ্গে তাকিয়ে) একটা কথা বলতে এসেছি, জজসাহেব। আমার কথাটি একবার শুনুন।

ভিখারিণী। ভয় নেই বুকে? দেখতে পাছেন না সর্বনাশীর আগমন? আমি মানুষ নই। দেখতে পাচ্ছেন না বিষধর সাপের মত আমি বুকে হেঁটে আসছি? মানুষ কি এভাবে চলে? আপনার সামনে মানুষ সাপ বনেছে। তার ক্ষুদ্র কুটিল চোখে হিংস্রতা, মুখে বিষ; অন্তরে অসীম জিঘাংসা।

আবদুস সাত্তার। (দু'পা সরে গিয়ে) দম্ভ-গর্ব নিয়ে আসি নি, এসেছি মিত্রতা হিতসাধনেচ্ছা নিয়ে, বন্ধু হিসেবে। জজসাহেব, নিঃসঙ্কোচে বেরিয়ে আসুন অন্ধকার থেকে।

ভিখারিণী। সাবধান, বলছি! আমি ঝোপঝাড়ের সাপ নই, পানি-ঢোঁড়া সাপ নই। আমার বিষ-থলি কখনো শূন্য হয় না, ক্রোধও নিঃশেষ হয় না। এই বিষ দিয়ে, এই ক্রোধ দিয়ে তাঁকে আমি রক্ষা করবো। কেউ আর নেই যখন, আমিই তাঁকে রক্ষা করবো। সাবধান! (হঠাৎ ভেঙ্গে পড়ে মাটিতে মাথা রাখে। শরীর কাঁপছে দেখা যায়)

আবদুস সাত্তার। (এবার নিশ্চিন্ত হয়ে) জজসাহেব, আমাদের মতভেদের কারণ যখন দূর হয়েছে তখন আমাদের মন-মিলনের পথে আর বাধা কি? আসুন মিলজুক করে ফেলি। আমার বন্ধুত্বের প্রমাণ যদি চান তবে এই দেখুন। (পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে) তাকিয়ে দেখুন। আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগপত্রটি পাঠানো আমি বন্ধ করেছি। আপনার প্রতি বন্ধুত্ব না থাকলে, আপনার মঙ্গল কামনা না করলে বাধা দিতাম কি?

ভিখারিণী। লজ্জা, লজ্জা! না, তবে জজসাহেব অন্ধকারের বুকে আশ্রয় নিয়েছেন! তাঁকে এ-লজ্জা আর ছুঁতে পারবে না।

আবদুস সাত্তার। শুধু বন্ধুত্বের কথাই বলতে আসি নি, আরেকটি কথা আছে। কার কাছে যাব জানি না, তাই আপনার কাছেই এসেছি। নিঃসন্দেহে আমারই জয় হয়েছে, কিন্তু এ-জয়ে কোন তৃপ্তি পাচ্ছি না যেন। (ইতস্ততঃ করে, গলা একটু নামিয়ে, দৃষ্টি নত করে) এই জয়ের ফল যেন ভীতি। ভীতি! কী অত্যাশ্চর্য পুরস্কার!

ভিখারিণী। (মাথা তুলে পাশে তাকিয়ে কৃত্রিম উল্লাসভরে) কোথায় আমার ভীত তরুণ বন্ধু, এসে দেখো, মজা দেখো। তোমার মত তারও মনে ভীতি! (হাসি)

আবদুস সাত্তার। (আপন মনে) কোন উত্তর কি নেই? ভীতির প্রাঙ্গণে খুঁটির মত প্রশ্নটি দাঁড়িয়ে আছে নিদারুণ ক্ষুধায় মুখ হা করে, সে-প্রশ্নের কোন উত্তরই কি নেই?

ভিখারিণী। (পূর্ববৎ ভঙ্গীতে) কোথায় গেলে হে আমার অবোধ বন্ধু? এসো, এসো, দেখো তোমার যমজভাই এসেছে। তোমার মতই সে প্রশ্নের উত্তর পায় না।

আবদুস সাত্তার। (মুখ তুলে এধার-ওধার চেয়ে) জজসাহেব! (থেমে গলা উঠিয়ে) জজসাহেব! (উত্তর না পেয়ে কিছুক্ষণ গভীরভাব-মগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অবশেষে হাতের কাগজটি ছিঁড়ে ফেলে হঠাৎ দৃঢ়পদে বেরিয়ে যায়। ভিখারিণী তার প্রস্থান তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, তারপর একটু অপেক্ষা করে উঠে দাঁড়িয়ে পাদপ্রদীপের সন্নিকটে এসে আঁচলে মুখ মুছে সরল এবং ঘরোয়াকন্ঠে দর্শকদের) জজ অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এলো না। কিন্তু তার কারণ আছে। জানতে চাও সে-কারণ? (এধার-ওধার তাকিয়ে) কী, জানতে চাও? (জজের খাটের দিকে তাকায়) তবে দেখ, তাকিয়ে দেখ। (সেখানে অনুজ্জ্বল আলো পড়বে। শূন্য বিছানা। তারপর আলো উপরে উঠলে দেখা যাবে ছাদ থেকে জজের দেহ দড়িতে ঝুলেছে) দেখলে তো? (দেহের উপর আলো নিভে যাবে)

আহা, একাকী প্রান্তর অতিক্রম করতে চেয়েছিলো, দড়ির বন্ধনে সে-যাত্রার অবসান ঘটেছে।

[পর্দা নাবতে শুরু করবে। ভিখারিণী মঞ্চের পশ্চাতে যাবে। একবার সংগোপনে আঁচল দিয়ে চোখ মুছবে। তারপর বাঁ দিকে জজের দেহের পানে চেয়ে কয়েকবার মাথা নাড়বে।]

॥ শেষ দৃশ্য ॥

[পর্দা উঠলে প্রথম দৃষ্টিতে মনে হবে দৃশ্যটি বুঝি প্রথম অঙ্কের অবিকল নকল। বেশভূষা, আসবাবপত্র, কাঠগড়া, জজের মঞ্চ—সবই ঠিক তেমনি। জজ, উকিল, কেরাণী, পুলিশ, মৌলবী আবদুস সাত্তার এবং শ্রোতাগণ প্রথম অঙ্কে যেখানে যে-ভাবে বসে বা দাঁড়িয়েছিলো এই অঙ্কেও তেমনি বসে বা দাঁড়িয়ে। আসামী আমেনাও যথাস্থানে আবছায়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে এবং পূর্বের মতই মূঢ় মানুষের ভাবশূন্য নিথরতায় সে স্থির-নিশ্চল।

তবে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে প্রথম অঙ্কের দৃশ্য এবং এ-অঙ্কের দৃশ্যের মধ্যে নানাবিধ প্রভেদ-তারতম্য পরিলক্ষিত হবে। পূর্বের অঙ্কের প্রথমভাগে জজ ঘুমিয়েছিলেন, এখন তিনি জেগে। শুধু তাই নয়। এ-দৃশ্যের জজ পদ মর্যাদাসচেতন, গুরু-গম্ভীর, সজ্ঞান-সতর্ক ব্যক্তি। এক কথায়, বিচারালয়ের সর্বাধ্যক্ষ, সত্যিকার বিচারক। তবে তিনি ছাদের দিকে তাকিয়ে নিশ্চলভাবে বসে। মঞ্চের সবাই তাঁর প্রতি সমীহশীল, কারো আচরণ-ব্যবহারে একটু অশ্রদ্ধা বা শিথিলতার ভাব নেই। সকলের দৃষ্টি জজের ওপর নিবদ্ধ।

মৌলবী আবদুস সাত্তারের চারিত্রিক রূপান্তরও নজরে পড়তে দেরী হবে না। এ-দৃশ্যের আবদুস সাত্তার সাদাসিদে গ্রাম্য মানুষ যাঁর কাছে বিচারালয়ের কাজকর্ম নিতান্ত রহস্যমণ্ডিত এবং যে-জন্যে জজের প্রতি তাঁর ভীতি বা শ্রদ্ধার অন্ত নেই।

আরেকটি তারতম্য। এ-দৃশ্যে নামহীন যুবককে নিদ্রাচ্ছন্ন দেখা যাবে। মাথা বুকের ওপর ঝুঁকিয়ে মুখ হা করে গভীর ঘুমে সে বিভোর।

এ-দৃশ্যের ভিখারিণীও পূর্ব-দৃশ্যের ভিখারিণী নয়। বস্তুতঃ তার ক্ষেত্রে পার্থক্যটি বিশেষ লক্ষণীয়! এই ভিখারিণীর ভগ্ন-শীর্ণ দেহ অতিশয় জীর্ণ-ছিন্ন পরিচ্ছদে আবৃত এবং তার চেহারায় বার্ধক্যের এবং নিষ্ঠুর দারিদ্র্যের সুস্পষ্ট লিখন। সে সুস্থমনাও নয়।

এ-দৃশ্যে পুলিশ ছাড়া সবাই বসে। চাপরাশীকে দেখা যাবে না। একটি পুলিশকে দেখা যাবে বাইরের দরজার পাশে।

শীঘ্র এ-কথাও বোঝা যাবে যে কোন কারণে বিচারলয়ের কার্য স্থগিত করা হয়েছে সাময়িকভাবে এবং জজ হতে শুরু করে সবাই কিছুর জন্যে অপেক্ষা করছে।

মঞ্চে প্রগাঢ় নীরবতা, যে-নীরবতার মধ্যে দেয়ালে টাঙ্গানো মস্ত ঘড়ির টিক্-টাক্ আওয়াজ স্পষ্টভাবে শোনা যাবে।

[এ দৃশ্যে কেউ কার্যে-ব্যবহৃত কন্ঠ ব্যবহার করবে না, কারণ বিচারালয়ের কার্য তার বিষয়বস্তু নয়।]

জজ। (ছাদ থেকে শুধু দৃষ্টি নামিয়ে দরজার দিকে তাকায়।)

সবাই। (ঘুরে দরজার দিকে তাকায়। আবার যখন তারা জজের দিকে তাকায় তখন তাঁর দৃষ্টি ছাদে প্রত্যাবর্তন করেছে। এবার জজকে মনে হয় ধৈর্যের মূর্তি।)

জজ। (কিছুক্ষণ পরে সে মূর্তিতে অতি সামান্য আলোড়ন জাগলে, ঈষৎ বিরক্তির সঙ্গে অনুচ্চ গলায়) এত দেরী হবে কেন? (দৃষ্টি পুনর্বার ছাদে ওঠে। চোখে-মুখে সবাই সমবেদনা প্রকাশ করে। কেউ ঘুরে আবার খোলা দরজার দিকে তাকায়।)

উকিল। তাই, এত দেরী হবে কেন?

মতলুব আলী। (উকিলকে, খাটো গলায়) উকিল সাহেব!

উকিল। (নিঃশব্দে তার দিকে তাকায়।)

মতলুব আলী। আপনার চশমা দিন্ না জজসাহেবকে! (চোরা চোখে জজের দিকে একবার তাকায়।)

উকিল। (উত্তর দেবে না ঠিক করে অবশেষে আস্তে বলে) এক ধরনের চশমা নয়।

মতলুব আলী। (ঝুঁকে) কি বললেন?

উকিল। (একটু জোরে) এক ধরনের চশমা নয়। জজসাহেবের চশমা পড়বার চশমা।

মতলুব আলী। (আবার চোরা চোখে একবার জজের দিকে তাকায়। কিন্তু জজের দৃষ্টি ছাদে নিবদ্ধ। তারপর আবার নীরবতা)

জজ। (আঙ্গুল দিয়ে টেবিলে কয়েকবার টোকা দিয়ে হঠাৎ কেরানীর দিকে তাকিয়ে, আস্তে) সাইকেলে করে পাঠাও নি?

কেরানী। (কাগজ থেকে মাথা তুলে শুষ্ক, অনুচ্চ গলায়) সাইকেলে করেই গেছে হুজুর।

উকিল। (হঠাৎ উচ্চ গলায়) জজসাহেবের বাড়ী দুই কদম মাত্র। এত দেরী হবে কেন? (জজের দিকে তাকায়। জজের দৃষ্টি কিন্তু ছাদে ফিরে গেছে। একটু অপেক্ষা করে আবার) চশমা ছাড়া জজসাহেব রায় পড়েন কি করে?

মতলুব আলী। উকিল সাহেব! দিন না আপনার চশমা। হয়তো লাগবে।

জজ। (এক নজর মতলুব আলীর দিকে তাকিয়ে) না, উকিল সাহেবের চশমা ভিন্ন ধরনের। তা দূরে দেখবার জন্য। (একটু থেমে কেরানীর দিকে একনজর তাকিয়ে) কবে তৈরী হবে?

কেরানী। (কাগজ থেকে চোখ তোলে কিন্তু প্রশ্নটা যেন ঠিক ধরতে পারে না। সাহায্যেরজন্যে এধার-ওধার তাকায়)

কেরানীর নিকটে দাঁড়ানো পুলিশ। (কেরানীর অচল মস্তিষ্কের জন্যে ভর্ৎসনার কন্ঠে, কিন্তু গলা চেপে) জজসাহেবের দ্বিতীয় চশমা জোড়া।

কেরানী। (অনুচ্চ কিন্তু অপেক্ষাকৃত দ্রুত কন্ঠে) আগামী কাল দেবে বলেছে হুজুর।

পুলিশ। তবে এদের কথার কিছু ঠিক নেই, হুজুর।

জজ। (নির্বাক)

উকিল। (না ভেবে কথা বলার খাতিরে) এক জোড়া চশমা হলে অসুবিধা হয় বৈকী।

পুলিশ। (গলা চেপে ভর্ৎসনার স্বরে) আরেক জোড়া ভেঙ্গে গেছে না?

উকিল। (ভুল ঢাকবার চেষ্টায়) সে-কথাই বলছিলাম। (দরজার দিকে তাকায়। কেউ কেউ তাকে অনুকরণ করে আবার কয়েক মুহূর্ত নীরবতা।)

আবদুস সাত্তার। (সঙ্কুচিতভাবে আলগোছে উঠে দাঁড়িয়ে অনিশ্চিত গলায়) হুজুর!

জজ। (মুখ না নেড়ে একবার তাকান তার দিকে।)

আবদুস সাত্তার। আশা করি আমার আর্জিটা ইনকার করেন নি, হুজুর। বড়ই গরীব মেয়েমানুষ। হাবাগোবা ধরনের। আসলে মাথার ঠিক নেই।

জজ। (নিরুত্তর। তবে মুখে এমন একটা ভাব জাগে যাতে এ কথা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, প্রশ্নটা অনুচিত হয়েছে।)

পুলিশ। (সজোরে ইশারায় আবদুস সাত্তারকে বসতে বলে।)

আবদুস সাত্তার। (পুলিশের ইশারা লক্ষ্য করলে কিছু অনিশ্চিত ভাব আসে তার মধ্যে। তবু জজ কিছু বলে নি দেখে দমিত না হয়ে আবার) একই গ্রামের মানুষ। সৎ গেরস্থঘর, কিন্তু তারা বড়ই গরীব হুজুর। প্রায় অনাহারেই দিন কাটে। তাছাড়া ব্যামার-ব্যাধি লেগেই থাকে।

উকিল। কে না অনাহারে দিন কাটায়, কে না ব্যামার-ব্যাধিতে ভোগে ?

পুলিশ। (সজোরে) বসেন মৌলবী সাহেব।

আবদুস সাত্তার। (আশান্বিত চোখে কিছুক্ষণ জজের দিকে তাকিয়ে থেকে) লোকেরা বলে আমেনাকে ফাঁসি দেবেন।

পুলিশ। (ধমকে) বসে পড়েন মৌলবীসাহেব !

আবদুস সাত্তার। (ইতস্ততঃ করে এধার-ওধার চেয়ে অবশেষে বসে পড়ে, মুখে ভ্যাবাচ্যাকা ভাব।)

জজ। (একটু নীরবতার পর ছাদের দিকে তাকিয়ে কোন অসন্তুষ্টির আভাস না দিয়ে বেখবরকে খবর দেবার কন্ঠে) রায় প্রস্তুত করার আগে সব আর্জিই যথাযথভাবে বিবেচনা করে দেখা হয়।

আবদুস সাত্তার। (কথাটার মর্মার্থ উদ্ধার করার চেষ্টা করে, কিন্তু বুঝতে পারে না সেটা ভাল কি খারাপ খবর। তারপর বুকে সাহস এনে) কিন্তু লোকেরা বলে তার ফাঁসি হবে।

জজ। (কিছুক্ষণ নীরব থেকে ছাদের দিকে তাকিয়েই) আসামীর অপরাধ বড়ই গুরুতর। (তারপর তাঁর দৃষ্টি গাম্ভীর্যে ভরে ওঠে।)

আবদুস সাত্তার। (কতক্ষণ জজের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর উকিলের দিকে তাকিয়ে কিছুটা সরল বিস্ময়ে অনুচ্চ কন্ঠে) তাহলে মেয়েলোকটির ফাঁসি হবে?

উকিল। (উত্তর দেয় না।)

পুলিশ। (সজোরে হস্ত সঞ্চালন করে আবদুস সাত্তারকে চুপ করতে বলে।)

আবদুস সাত্তার। (এবার জজকে, শুষ্ককন্ঠে) তা'হলে তার ফাঁসিই হবে হুজুর?

উকিল। (উচ্চকন্ঠে) জজসাহেব বলেছেন আসামীর অপরাধ বড়ই গুরুতর! (বিরক্তি প্রকাশ করে ঘুরে বসে।)
[আবদুস সাত্তার বিহ্বল দৃষ্টিতে চারধারে তাকায়। নীরবতা।]

জজ। (এবার সর্বপ্রথম ধৈর্য হারিয়ে অসহিষ্ণুতার ভাব দেখিয়ে,) কোথায় গেলো চাপরাশী?
(সকলে সচকিত হয়ে দরজার দিকে দৃষ্টি দেয়। জজ আবার ছাদের দিকে তাকায়। কিন্তু পূর্বের মত আর ধৈর্যশীল মনে হয় না। সকলের দৃষ্টি জজের দিকে ফিরে যায়।)

পুলিশ। (দরজার নিকট থেকে সজোরে উৎফুল্লভাবে) এই যে এসেছে! চাপরাশী এসে পড়েছে হুজুর।
(মঞ্চ হঠাৎ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। নিদ্রাভিভূত যুবক ব্যতীত সকলের দৃষ্টি দরজার দিকে ছুটে যায়। সবাই চাপরাশীর আবির্ভাবের জন্যে রুদ্ধনিঃশ্বাসে অপেক্ষা করে।)

পুলিশ। (একটু পরে, লজ্জিতভাবে) না হুজুর, আমাদের চাপরাশী নয়, ছোট জজের চাপরাশী। সে-ও সাইকেলে করে আসছে বলে চোখের ভুল হয়েছিলো।

জজ। (হঠাৎ রেগে উঠে) কী হলো চাপরাশী ব্যাটার? এত দেরী হবে কেন?

উকিল। কী দিক্কত! কতক্ষণ জজসাহেব অপেক্ষা করবেন? তাঁর সময়ের মূল্য নেই?

আবদুস সাত্তার। (আপন মনে) খোদাই ভরসা, খোদাই মালিক।

উকিল। (জজের মন ভুলাবার চেষ্টায়) এক জোড়া চশমার জন্যে রায় হাতেও আপনাকে অপেক্ষা করতে হচ্ছে দেখে একটি ঘটনা মনে পড়ে গেলো। (থেমে, গল্প বলার ভঙ্গীতে) তখন ল-কলেজে সবেমাত্র ঢুকেছি। আমাদের এক প্রফেসর ছিলেন যিনি চশমা ছাড়া কিছুই দেখতে পেতেন না—না দূরের জিনিস না কাছেরও জিনিস।

জজ। (শুনবার চেষ্টা করেন কিন্তু পরিষ্কার বোঝা যায় উকিলের কথা তাঁর কানে ঠিক ঢুকছে না।)

উকিল। নামটা যেন কী? প্রফেসর হিসেবে তার বেশ খ্যাতি ছিলো। কী আশ্চর্য, নামটা কিছুতেই মনে পড়ছে না। (থেমে মনে করবার চেষ্টা করে।)

আবদুস সাত্তার। (উকিলের নীরবতার সুযোগে) জজসাহেব!

উকিল। না, নামটা কিছুতেই মনে পড়ছে না। আজকাল নাম-টাম সহজে মনে পড়তে চায় না যেন। যা হোক—

পুলিশ। (উত্তেজিতভাবে) এই যে চাপরাশী আসছে!

উকিল। (বাধা পেয়ে) আবার ভুল করছো না তো?

পুলিশ। না উকিলসাহেব, আমাদের চাপরাশীই বটে। তেজবেগে আসছে মাঠভেঙ্গে।

উকিল। তেজবেগে আসছে ভালো কিন্তু পড়ে গিয়ে জজসাহেবের চশমা ভেঙ্গে না ফেলে আবার।

পুলিশ। না, নিজের হাত-পা ভাঙ্গবে জজসাহেবের চশমা ভাঙ্গবে না। কাজকর্মে লোকটি বড় হুঁসিয়ার।
(আবার সকলের দৃষ্টি ছুটে যায় দরজার দিকে, আবার সবাই রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করে চাপরাশীর জন্যে। অল্পসময়ের মধ্যে ঝড়ের মত চাপরাশী প্রবেশ করে। মঞ্চ অতিক্রম করে জজের হাতে সে খাপে-ভরা চশমা দেয়।

জজ। (চশমা নিয়ে চাপাক্রোধে) এত দেরী হলো কেন তোমার?

চাপরাশী। (হাঁপাতে-হাঁপাতে) আমার দোষ নেই হুজুর, আপনার চশমা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিলো না। বাড়ীর সবাই খুঁজতে-খুঁজতে হয়রান। অবশেষে বৈঠকঘরে সোফার নীচে তা পাওয়া গেলো।

পুলিশ। না, হুজুর, বেহুদা দেরী করার লোক নয় সে।
(জজ নীরবে চশমা সাফ করেন এবং সে-সময়ে ক্রোধও সম্বরণ করেন। তারপর চশমা পরে রায় পড়বার জন্যে তৈরী হন। তবে পড়া শুরু করার আগে হঠাৎ নিদ্রাভিভূত যুবকের দিকে তাকান, চোখে অননুমোদনের ভাব। তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে সকলের দৃষ্টি যুবকের দিকে যায়। শীঘ্র যুবকের এক প্রতিবেশী নিম্নকন্ঠে তাকে কিছু বলে, এবং তাতে ফল না হলে তাকে ধাক্কা দেয়। এবার সচকিতভাবে জেগে উঠে যুবকটি চতুর্দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকায়, মনে হয় কিছুই সে বুঝতে পারছে না।
সহসা জজসাহেব হাতুড়ি পেটান, তাঁর দৃষ্টি টেবিলে রাখা অদৃশ্য রায়ের উপর।)

—যবনিকা—

2

[illegible] গ্রন্থাগার